জীবনী-বিচিত্রা

যাঁদের কর্মে ও জ্ঞানে মানুষ বড়ো
হয়েছে তাঁদের জীবন ও সাধনার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাক্ষর
১১বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা-২

মেঘনাদ সাহা

কমলেশ রায়

জীবনী-বিচিত্রার অষ্টম বই

সরস্বতী পুজো

৩রা ফাল্গুন ১৩৬২, ইংরেজী ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, চারিদিকে আনন্দের ঢেউ। ছেলেমেয়েরা সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে রঙীন জামাকাপড় পরে ঘুরছে, বড়োরাও হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করছে, মাইক্রোফোনে গানবাজনা বেজে চলেছে। অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেলো। তারপর প্রসাদ বিতরণ, গল্পগুজব, বন্ধুবান্ধবদের মেলামেশা, পরামর্শ। কিসের পরামর্শ? সন্ধ্যাবেলা নাটক অভিনয় হবে। আজ সরস্বতী পুজো, আজ ছুটি, পড়তে নেই লিখতে নেই, কারণ সরস্বতী বিদ্যার দেবী। কিন্তু গানবাজনা করতে হয়, নাটক অভিনয় করতে হয়, কারণ সরস্বতী সঙ্গীত ও চারুকলার দেবী। তাই তো, দুটোর বেলা দু-রকম নিয়ম কেন? যাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই, এই রকমই চলে আসছে।

আর খেলার মাঠে? ক্রিকেট! আজ যে সরস্বতী পুজোর ছুটি।

চারিদিকে গান-বাজনা, আনন্দ, খেলা।

হঠাৎ রেডিওতে খবর এলো : মেঘনাদ সাহা ইহলোক ত্যাগ করেছেন! বিশ্বাস করা যেন অসম্ভব। এই তো দুদিন আগের খবর, তিনি দিল্লী গেলেন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগ দিতে। যাবার আগে কতোজন তাঁর সঙ্গে দেখা করলো দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের কথা লোকসভায় বলবার জন্য। আর আজ কী শুনছি? অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা আর ইহজগতে নেই!

সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে গান-বাজনা-থিয়েটার বন্ধ হলো, খেলার মাঠে ক্রিকেট বন্ধ হলো। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে দু মিনিট দাঁড়ালো এই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে। শুধু কলকাতায় নয়, শুধু দিল্লীতে নয়, সারা ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষের বাইরেও সমগ্র বিজ্ঞানজগতে।

কে এই মহাপুরুষ যাঁর মৃত্যুতে দেশে বিদেশে সবাই এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলো?

বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা শুধু বাঙলার সুসন্তান নন, ভারতের গৌরব, জগতের মানব বন্ধু। বিজ্ঞান ছিলো তাঁর সাধনা, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র। বিজ্ঞানকে তাঁর মণিকোঠায় বন্ধ করে রাখেন নি। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কী করে দেশের কাজে, মানুষের কাজে লাগাতে হয় তাই ছিলো তাঁর সাধনা।

এর বছর দুই আগেকার কথা। সরস্বতী পুজো আসছে। কলকাতায় পাড়ার ছেলেরা চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়েছে। বাড়িবাড়ি ঘুরে অবশেষে তারা গিয়ে উঠলো অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার বাড়িতে।

"কী চাই তোমাদের?" অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন।

"চাঁদা দিতে হবে। আমরা সরস্বতী পুজো করব"—ছেলেরা বললো।

মেঘনাদ সাহা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করে সরস্বতী পুজো করবে বলো তো?

ছেলের দল অবাক হলো। ভাবলো, এত বড়ো পণ্ডিত মানুষ, কী করে সরস্বতী পুজো করতে হয় জানেন না? একজন এগিয়ে এলো, বললো "কেন, আমরা প্রতিমা গড়তে দিয়েছি, প্যাণ্ডেল বাঁধছি, মাইক্রোফোন ভাড়া করছি। তারপর পুরুত আসবে, পুজো হবে।"

মেঘনাদ সাহা বললেন, "উঁহু, হলো না। সরস্বতী পুজো কী করে করতে হয় দেখবে এসো।"

ছেলের দল গুটিগুটি তাঁর পিছনে পিছনে চললো। তিনি ওদের নিয়ে গেলেন ওঁর দোতলার ঘরে! একদিকে একটা খাট। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, তার ওপর গাদা-করা বই কাগজ পত্র দোয়াত কলম পেন্সিল। দেয়ালের গা দিয়ে উঠেছে সারিসারি তাক, তাতে হাজার হাজার বই—মোটা পাতলা বড়ো ছোটো ইংরেজী বাঙলা সংস্কৃত জার্মান ফরাসী। বেশির ভাগই বিজ্ঞানের, তাছাড়া ইতিহাস' দর্শন ইত্যাদি।

ছেলের দল তো অবাক।

উনি বললেন, "এইভাবে সরস্বতী পুজো করতে হয়।"

আরো আগে। বহু আগে। তখন বালক মেঘনাদ দেশে গ্রামের পাঠশালায় যায়, বাবার দোকানে বসে।

সেই সময়ের কথা। পুজোমণ্ডপে পুরুত ঠাকুর মেঘনাদকে অঞ্জলি দিতে দিলো না, কারণ সেখানে ব্রাহ্মণের ছেলেরা অঞ্জলি দিচ্ছে। বালক মেঘনাদ অপদস্থ হয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমাদের দেশের জাতিভেদের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর মন রুখে উঠলো।

স্কুলে

ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে মেঘনাদের জন্ম, ৬ই অক্টোবর ১৮৯৩ সালে। বাবার নাম জগন্নাথ সাহা, মার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। বাপ-মার পঞ্চম সন্তান মেঘনাদ।

গ্রামে ছোটো দোকানটি চালিয়ে সংসার চলে কোনো মতে। সেই আয় থেকে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। সংসারের আয় অল্প, কিন্তু মার সুনিপুণ ব্যবস্থায় অভাব-অনটন কেউ বিশেষ বুঝতে পারে না।

গ্রামে থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো মুশকিল। সব গ্রামে স্কুল নেই। কোনো গ্রামে যদি একটা ভালো স্কুল থাকে তো আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলেরা হেঁটে এসে স্কুলে পড়ে। শেওড়াতলী গ্রামে হাই স্কুল ছিলো না। মেঘনাদ কোথায় পড়বে? ঢাকা শহরে অনেক স্কুল আছে, কিন্তু সে ত্রিশ মাইল দূর। তার চেয়েও গোড়ায় সমস্যা, ছেলেকে হাই স্কুলে পড়িয়ে কী হবে? বাবা ভাবলেন, এই

তো বড়ো ছেলে জয়নাথকে (মেঘনাদের বড়ো দাদা) ইংরেজী স্কুলে পড়ালাম, কিন্তু সংসারের আয় তো কিছু বাড়লো না। বাবা ঠিক করলেন মেঘনাদকে দোকানের কাজ শেখাবেন।

মেঘনাদ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, আর অবসর সময়ে দোকানে বাবাকে সাহায্য করে। কিন্তু দোকানের কাজে মন বসে না। বাবা দেখলেন এ ছেলেকে দিয়ে দোকানের কাজ চালানো যাবে না। প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার মশাইরা দেখলেন মেঘনাদ লেখাপড়ায় খুব ভালো। তাঁরা জগন্নাথবাবুকে বললেন মেঘনাদকে যেন প্রাইমারি স্কুলের পরেও পড়ানো হয়।

কিন্তু কাছেপিঠে হাইস্কুল কোথায়? ঢাকা শহর তো ত্রিশ মাইল দূর। তাহলে অসম্ভব। মন্দের ভালো একটা মিড্‌ল্ স্কুল আছে শিমুলিয়া গ্রামে, সাত মাইল দূরে। কিন্তু সাত মাইল তো রোজ হেঁটে যাতায়াত করা যায় না।

বড়োদাদা জয়নাথ মেঘনাদের চেয়ে তেরো বছরের বড়ো। নিজে লেখাপড়া শিখেছেন; ভাইয়ের লেখাপড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। মেঘনাদকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতেই হবে। জয়নাথ শিমুলিয়া গেলেন। খোঁজখবর করে অনন্তকুমার দাশকে ধরলেন। অনন্তবাবু শিমুলিয়া গ্রামের ডাক্তার। তিনি মেঘনাদকে বাড়িতে রেখে স্কুলে পড়বার সুযোগ করে দিলেন। এই ঋণ মেঘনাদ চিরদিন মনে রেখেছিলেন।

শিমুলিয়ার মিড্‌ল্ স্কুল থেকে মেঘনাদ পাস করলেন বৃত্তি পেয়ে, ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে।

লেখাপড়া চালানো এবার খানিকটা সহজ হলো। বৃত্তি নিয়ে মেঘনাদ ১৯০৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। সেরা ছাত্র বলে স্কুলের মাইনে মাফ হলো, তাছাড়া স্কুল থেকে একটা ছাত্রবৃত্তি পেলেন।

যাক্, তাহলে আর বোধহয় কোন বাধাই রইলো না। কিন্তু হলো অন্যরকম।

ইংরেজ গবর্নমেন্ট বাঙলাদেশকে জোর করে দু ভাগ করলো। ওদের বরাবরকার মতলব কী করে ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়া যায়, যাতে এদেশের লোকরা একজোট না হতে পারে। তেমনি ভারত ছেড়ে যাবার সময়ও ১৯৪৭ সালে ভারতকে দু-ভাগ করে কী দুর্দশা সৃষ্টি করে গেলো। যাই হোক, ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলো। এই সময় বাঙলার গবর্নর স্যার র‍্যাম্ফিল্ড ফুলার এলেন স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করতে। ছাত্ররা হরতাল করলো, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হিসাবে। বালক মেঘনাদ পড়লেন তার মধ্যে। বহু ছাত্র বিতাড়িত হলো, মেঘনাদও। মেঘনাদের ছাত্রবৃত্তি কাটা গেলো।

আবার দারিদ্র্য অনটন। গবর্মেন্ট স্কুলে পড়া বারণ হয়ে গেলো। কী করা যায়? তখন মেঘনাদ ভর্তি হলেন ঢাকায় কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলে। এই স্কুল মেঘনাদকে বিনা মাইনেতে ভর্তি করে নিলো, একটা ছোটগোছের ছাত্র-বৃত্তিও দিলো। বড়োদাদাও কিছু কিছু সাহায্য করতে লাগলেন। মেঘনাদ আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মেঘনাদ ঢাকার ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনে বাইবেল ক্লাসে ভর্তি হলেন। ক্রীশ্চান হবেন নাকি! মোটেই না। মেঘনাদের বরাবরই ইতিহাস পড়বার দিকে ঝোঁক। দেশবিদেশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে তাদের ধর্মও জানতে হয়। মেঘনাদ হিন্দু, ক্রীশ্চান, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ধর্মগ্রন্থ সারাজীবনে অনেক পড়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের কথা জানতে পারা যায়, এমনকি বিজ্ঞানের ইতিহাসও, বিশেষ করে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের ইতিহাস। যাই হোক, বাইবেল ক্লাসে ভর্তি হয়ে মেঘনাদ খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। বাইবেলের পরীক্ষা এলো—সারা বাঙলাদেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। কলেজের ছাত্ররাও এই পরীক্ষায় বসলো। পরীক্ষায় প্রথম হলো স্কুলের ছেলে মেঘনাদ। পুরস্কার পেলেন এক শ টাকা, আর ঝকঝকে বাঁধানো একটা বাইবেল।

১৯০৯ সালে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ইংরেজী, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় জড়িয়ে নম্বর পেলেন সবচেয়ে বেশি, তাছাড়া অঙ্কেও প্রথম।

লেখাপড়ায় অনুরাগ মেঘনাদের বরাবরই ছিলো। যা শিখতেন তা খুব ভালো করে শিখতে চাইতেন। আর, তাঁর ছিলো শিক্ষকদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা। তাই তিনি যখন বড়ো হয়ে শিক্ষক হলেন, ছাত্রদের কাছ থেকে সেই শ্রদ্ধা ফিরে পেলেন।

কলেজে

এণ্ট্রেন্স পাশ করে মেঘনাদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে বিজ্ঞান পড়তে পড়তে জার্মান ভাষা শিখতে লাগলেন। জার্মান ভাষা শিখবার দুটো কারণ ছিলো। এই বয়সেই তিনি বিজ্ঞানের পথ বেছে নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক হতে হবে। বিজ্ঞানের অগাধ সম্পদ আছে জার্মান ভাষায়। জার্মানিতে বিজ্ঞানের গবেষণা হয় প্রচুর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, আই. এস্-সি পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় নেওয়া, যাতে পরীক্ষায় নম্বর ওঠে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক—এই হলো তিনটি প্রধান বিষয়। চতুর্থ বিষয় বা ফোর্থ সাবজেক্ট হলো জার্মান ভাষা। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডক্টর নগেন্দ্রনাথ সেনের কাছে জার্মান শিখতেন; তিনি তখন সবে জার্মানি থেকে পি. এইঁচ্. ডি. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। আরো কয়েকজন বাছাবাছা নামকরা অধ্যাপকের কাছে মেঘনাদ পড়েছেন। অঙ্ক পড়তেন অধ্যাপক কালীপদ বসুর কাছে,—যে কে. পি. বোসের অ্যালজেব্রা সব স্কুলে পড়ানো হয়।

মেঘনাদ আই. এস্-সি পরীক্ষায় গণিত আর কেমিস্ট্রিতে প্রথম হলেন। সব জড়িয়ে তৃতীয় স্থান পেলেন। প্রফেসররা মেঘনাদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সাহেব প্রিন্সিপ্যাল আর্চবল্ড বুঝেছিলেন এই ছেলে ভবিষ্যতে বড়ো বৈজ্ঞানিক

হবে। কলেজ ছাড়বার পরেও বহুদিন পর্যন্ত চিঠিপত্র আদানপ্রদান চলতো এঁদের মধ্যে।

ঢাকা ছেড়ে কলকাতা এলেন বি.এস্-সি পড়তে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯১১ সালে অঙ্কে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন। অনেক ভালো ভালো ছাত্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছে। এঁদের অনেকেই পরে জ্ঞানী গুণী হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। মেঘনাদের সহপাঠী সত্যেন্দ্র-নাথ বসু বিজ্ঞানজগতের আর-এক দিকপাল। অন্য সহপাঠীদের মধ্যে নিখিলরঞ্জন সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের অধ্যাপক হলেন। অন্যান্য সহপাঠী জ্ঞান-চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে—এঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। এছাড়া প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও নীলরতন ধর—এঁরা দু-এক ক্লাস ওপরে। শরৎচন্দ্র বসু সহপাঠী, সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) বছর তিনেকের ছোটো।

ভেবে দেখো মনস্বিতার কি অপূর্ব সমাবেশ। এঁরা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য। আর দেখো কাদের কাছে এঁরা শিক্ষা পেয়েছেন। জগদীশচন্দ্র বসু এঁদের ফিজিক্স পড়াতেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পড়াতেন কেমিসট্রি, অঙ্ক পডাতেন ডি. এন্. মল্লিক। এই সব বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনচেতা অধ্যাপকেরা শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়েছেন তা নয়, স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণাও জাগিয়েছেন ছাত্রদের মধ্যে।

বি. এস্-সি ও এম্. এস্-সি দুটো পরীক্ষাতেই মেঘনাদ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেলেন। প্রথম স্থান অধিকার

করলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর বিষয় ছিলো গণিত। অঙ্কই হলো বিজ্ঞানের প্রধান কাঠামো।

কলেজের লেখাপড়া শেষ করে মেঘনাদের প্রধান চিন্তা হলো কী চাকরি করা যায়। ভালো ছাত্ররা সাধারণত কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দেয়, যেমন আই. সি. এস, বা ঐরকম কিছু। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাড়াতাড়ি চাকরি চাই। ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়া ঠিক করলেন। কিন্তু গবর্নমেণ্টের কোপ নজরে পড়লে কি করে ওসব পরীক্ষা দেওয়া যায়? কে কে এ সব পরীক্ষায় বসতে পারবে তা তখনকার ইংরেজ গবর্নমেণ্ট বেছেগুছে নিতো। পুলিস তদন্ত হতো : ছেলে ভালো তো, না, স্বদেশী করে?

যুবক মেঘনাদ স্বদেশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত? বন্ধুদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র, বাঘা যতীন, লাঠিয়াল পুলিন দাশ। বি. এস্-সি পাস করে (১৯৩১) এম্. এস্-সি পড়বার সময় মেঘনাদ থাকতেন ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীট-এর মেস-এ। সেটা ১৯১৩-১৯১৫ সালের কথা। বুঝতেই পারছো, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধেছে, ১৯১৪ সালে। আর ঐ ছাত্রাবাসে যতীন্দ্রনাথ মুখোজ্যের যাতায়াত। একা হাতে ভোজালি দিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঘ মেরেছিলেন বলে সবাই তাঁকে বাঘা যতীন বলতো। শুধু গায়ের জোরই সব নয়; আসলে ছিল মনের জোর। বাঘ মেরেই যতীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নি, ব্রিটিশ সিংহকেও হটাতে হবে আমাদের দেশ থেকে, এই পণ করলেন। ওদিকে ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ বেধেছে, এই তক্কে

যদি ভারতবর্ষে একটা স্বাধীনতার বিপ্লবী সংগ্রাম বাধিয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে কাবু করা যায়, এই ছিলো বাঘা যতীনের প্ল্যান। ঐ ছাত্রাবাসে বাঘা যতীন যাতায়াত করেন, মধ্যে মধ্যে রাতে ওখানে থেকে যান। যতীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন সুন্দরবনে অস্ত্রশস্ত্র আসবে, জার্মানরা পাঠাবে। তাই দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে। কিন্তু তার আগেই বাঘা যতীন বালেশ্বরে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। এদিকে পুলিন দাশ এক ব্যায়ামাগার খুললেন, ছেলেমেয়েদের লাঠি খেলা ও অসিশিক্ষা (তলোয়ার খেলা) শেখাতে লাগলেন আর তাদের স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দিতে লাগলেন। পুলিসের নজর পড়ল আখড়ার ওপর।

এই সব স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে জানাশোনা থাকার ফলে মেঘনাদ ফাইনান্স পরীক্ষায় বসতে অনুমতি পেলেন না। অবশ্য তিনি কার্যকরী ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যান নি। যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না, কারণ সংসারে আর্থিক অনটন,—ভাইদের লেখাপড়া চালাতে হবে। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞানের সাধনায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে। এই সংকল্প করলেন মেঘনাদ।

ছাত্র পড়িয়ে নিজের ও ভাইয়ের খরচ চলে। দু-তিন জায়গায় ছাত্র পড়াতে হয়, শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর। ট্রামের খরচও তখন গায়ে লাগে। হেঁটে আর সাইকেলে যাতায়াত করতে হয়।

শিক্ষকতা ও গবেষণায়

এম. এস্-সি পাশ করার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯১৬ সালে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেঘনাদকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের লেকচারার করে দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওপরওয়ালা অধ্যাপক গণেশ প্রসাদের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার বনলো না। তখন মেঘনাদকে বদলী করে দেওয়া হলো ফিজিক্স-এর লেকচারার করে।

গণিত থেকে পদার্থবিজ্ঞান (ফিজিক্স)। এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে হবে। নিজে ফিজিক্স পড়েছেন বি. এস-সি অবধি, অঙ্কে অনার্স ছিল। তারপর এম. এস-সি পড়েছেন অঙ্কে। কঠিন কাজ হবে বই কি! কিন্তু মেঘনাদ ভাবলেন অঙ্কই হচ্ছে ফিজিক্সের কাঠামো, অন্যান্য ব্যাপার পড়ে নিতে হবে, এই যা। খাটুনি আছে, কিন্তু পিছপাও হবার কিছু নেই।

মেঘনাদ ভালো করে ফিজিক্স পড়তে লাগলেন, ভীষণ খাটতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই পড়ানোর বিষয়গুলি রপ্ত করে নিলেন, ছাত্রদের জন্য ল্যাবরেটরিও গুছিয়ে দিলেন।

শুধু এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর জন্যই মেঘনাদ পড়তেন তা নয়, নিজে ফিজিক্স-এ গবেষণা করবেন

বলেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন। জার্মান ভাষা জানা ছিলো বলে, এ ব্যাপারে তাঁর খুব সুবিধা হয়েছিলো। মেঘনাদ আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরিও জার্মান ভাষায় পড়ে ফেললেন। এক দিকে অঙ্কে অগাধ দখল, তার ওপর জার্মান ভাষা পড়তে পারার সুবিধা। রিলেটিভিটি বুঝতে মেঘনাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরিতে কী বলে? সে অনেক ব্যাপার, খুব শক্ত ব্যাপার, অনেক অঙ্ক কষে বুঝতে হয়, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু এই সূত্রে একটা ঘটনা বলছি।

১৯১৯ সালে খবর এলো আইন্‌স্টাইনের থিওরির পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আইন্‌স্টাইন অঙ্ক কষে যা যা বলেছেন, তা ঠিক। সূর্যের পাশ দিয়ে তারার আলো বেঁকেছে, আইন্‌স্টাইন যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে।

ব্যাপারটা কী?

সেই তো মুশকিল হয়েছিলো। খবরটা এলো স্টেট্‌সম্যান কাগজে, বিলেত থেকে টেলিগ্রামে। কাগজে এ-খবর ছাপা হবে। কিন্তু কাগজওয়ালারা জানে না ব্যাপারটা কী! কলকাতায় কেউ জানে কি? কেউ বলতে পারবে আইন্‌স্টাইন কে? কী তাঁর থিওরি? কী প্রমাণ হলো? ভারতবর্ষে কেউ জানে রিলেটিভিটি সম্বন্ধে? ধরতে গেলে পৃথিবীতেই বা কটা লোক এ সম্বন্ধে জানে? স্টেট্‌সম্যানের লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো যদি কেউ ব্যাপারটা

বুঝিয়ে দিতে পারে। কাগজের রিপোর্টার বেচারা খুঁজতে খুঁজতে এলো প্রেসিডেন্সি কলেজের জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিভাগে যেখানে দুরবীন আছে। এও তো সূর্য-তারার ব্যাপার; খবরে তো তাই বলছে। তাহলে এখানে কেউ কি কিছু বলতে পারবে না এ সম্বন্ধে?

ভাগ্যক্রমে রিপোর্টার দেখা পেলো মেঘনাদ সাহার। মেঘনাদ তখনই বসে বুঝিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি কী বলে, আর তারা-সরা পরীক্ষায় কী করে রিলেটিভিটি থিওরির প্রমাণ পাওয়া গেলো। পরদিন মেঘনাদের সেই লেখা স্টেট্সম্যান কাগজে বেরুলো।

ব্যাপারটা বলছি। আইন্‌স্টাইনের রিলেটিভিটি মতে আলোর ভর বা ওজন আছে। আলোকরশ্মিগুলি যেন খুদে খুদে কণা, আলোর কণা। তা যদি হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণ আলোকে টেনে বেঁকিয়ে দেবে। সামনে ঢিল ছুঁড়লে পৃথিবীর টানে (মাধ্যাকর্ষণের জোরে) যেমন বেঁকে পড়ে। ছোটো কাঁকরও তেমনি বেঁকে পড়বে, বন্দুকের গুলি-ও। আলো যদি জড়কণার মতো হয়, আইনস্টাইন যেমন বলছেন, তাহলে আলো-ও মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঁকবে। আমরা জানতাম আলো যায় সোজা পথে। টর্চলাইট জ্বাললাম, সোজা গিয়ে রাস্তার ওপারে বাড়ির দেয়ালে আলো পড়লো। কই, ঢিলের মতো বেঁকে মাটিতে পড়লো না তো। তবে আইনস্টাইন কী সব বিদঘুটে কথা বলছেন?

তা বটে। কিন্তু একটা কথা। ঢিল যেমন আস্তে

ছুঁড়লে দশ হাতের মধ্যে বেঁকে পড়ে, জোরে ছুঁড়লে দশ হাতের মধ্যে ততটা বাঁকে কি? না। যতো জোরে ছুঁড়বে ততো কম বেঁকবে। বন্দুকের গুলি দশ হাতের মধ্যে কত-টুকু বাঁকে? সিকি ইঞ্চিও না। বন্দুকের গুলি সেকেণ্ডে ধরো, পাঁচশো ফুট যায়। আলো ছোটে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল! তাই পৃথিবীর টানে আলো বেঁকলেও এত অল্প বেঁকবে যা ধরা যাবে না। পৃথিবীর টান আলো বাঁকানো ব্যাপারে বড়োই কম-জোর।

তাই আইনস্টাইন বললেন, সূর্যটা অনেক বড়ো, তার মাধ্যাকর্ষণও তেমনি বেশি। সূর্যের পিছনে তারা আছে আরো বহু কোটি মাইল দূরে। সেই সব তারার আলো সূর্যের গা ঘেঁষে যখন আমাদের কাছে আসবে তখন সূর্যের টানে তারার আলো বেঁকবে, আর মনে হবে তারাটা একটু যেন সরে গিয়েছে। কিন্তু মুশকিল, সূর্যের তেজের সামনে তারার আলো এত ক্ষীণ, দেখাই যাবে না যে! আইনস্টাইন বললেন, এটা পরীক্ষা করতে হলে সূর্য থাকবে অথচ সূর্যের তেজ থাকবে না, এমন একটা অবস্থায় আসা চাই। সে অবস্থা আসবে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণের সময়। তখন পরীক্ষা করে দেখো। ১৯১৯ সালে ১৯শে মে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হলো। বৈজ্ঞানিকরা দূরবীন-ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন আইনস্টাইনের গণনা ঠিক। সেই খবরই ছড়িয়ে পড়লো। ভারতবর্ষে মেঘনাদ সাহা সেটা সবার কাছে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

এরপর মেঘনাদ সাহা আর তাঁর সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দুজনে মিলে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজীতে তর্জমা করলেন। সেটা ছাপা হলো বই হয়ে। মেঘনাদ তারপর নিজে গবেষণা চালাতে লাগলেন। বেশির ভাগই অঙ্কের ব্যাপার। এইসব তথ্য ছাপা হতে লাগলো বিলেত ও আমেরিকার বিজ্ঞানের সেরা পত্রিকায়।

মেঘনাদ একবার একটা গবেষণার তথ্য আমেরিকায় ছাপতে পাঠালেন। সেটা ছাপা হয়নি। পড়েছিল ইয়ার্কেস মানমন্দিরে আপিসের দেরাজে। ছাপা হয়নি কিন্তু কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক সেটা পড়ে ছিলেন। কয়েক বছর পরে (১৯২১ সালে) অক্সফোর্ডের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মিল্‌নে ঐ তথ্য থেকে আরো অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। মিল্‌নে সাহেব তাঁর তথ্যের মধ্যে লিখেছিলেন—সাহার মূল ধারণা থেকেই আমি আমার তথ্যের রসদ পেয়েছি।

আইনস্টাইন বলেছিলেন আলোর জড়মান (mass) আছে। তারও আগে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, আলো চাপ দেয়। বাতাস যেমন চাপ দেয় পালতোলা নৌকার পালে, অনেকটা সেই রকম। অর্থাৎ, তুমি জানলা খুললে, রোদ এসে পড়লো তোমার গায়ে ; রোদ তোমাকে ধাক্কা দেবে, চাপ দেবে। সে কী ? আমরা তো রোদের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ি না !

আলোর ধাক্কা এত কম-জোর যে আমরা বুঝতেই পারি না। বুঝতে হলে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র দরকার। ম্যাক্সওয়েল

'আলোর চাপ' অঙ্ক দিয়ে বুঝেছিলেন। কিন্তু কেউ পরীক্ষা করে দেখাতে পারেননি, ম্যাক্সওয়েল সাহেব নিজেও না। রাশিয়াতে ও আমেরিকার প্রথম দিকে (১৯০০-১৯০২) এই পরীক্ষা-প্রমাণ নিয়ে খুব চেষ্টা চলেছিলো, কিন্তু কেউই সঠিক ভাবে কিছু পেলেন না।

মেঘনাদ সাহা সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করে নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দিলেন ম্যাক্সওয়েলের আলোর চাপ কথাটা হুবহু ঠিক। এই গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদকে ডক্টর অব্ সায়েন্স (ডি. এসসি) উপাধি দিলেন ১৯১৮ সালে। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। এই বছর তিনি বিবাহ করেন।

পরের বছর ডাঃ সাহা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। এছাড়া গুরুপ্রসাদ ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তিও পেলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে ডাঃ সাহা বিলেত চললেন তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো বাড়াতে।

সূর্য্যের আলো কেমন? সূর্য্যে কী আছে?

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে মাথা ঘামান। এঁদের বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা অ্যাস্ট্রনমার। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর--অর্থাৎ চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারার চলাচল তাঁরা পরীক্ষা করেন। আর অঙ্ক কষে বলে দেন ভবিষ্যতে কোনটি কোথায় থাকবে। আর

ভাবেন, কী নিয়মে এই দুনিয়া বাঁধা ? সূর্য-চন্দ্র-তারকার অবস্থান বুঝে তৈরী হয় আমাদের বছর গুনবার দিনপঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার। সে কথা পরে বলবো।

আর-এক দল বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা আরো তলিয়ে দেখতে চান। ভাবেন, কী মালমশলা দিয়ে সূর্য-তারকা তৈরী হয়েছে ? কী করে তাদের এত আলো ? সূর্যটা কী ? তারার আলোয় আর সূর্যের আলোয় কী প্রভেদ। সব তারার আলো এক রকমের নয়। সূর্যটাও একটা মাঝারি আকারের তারা। সূর্য আমাদের খুব কাছে, মাত্র নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে, তাই সূর্যকে এতো বড়ো দেখায়, এতো তাপ ও আলো পাই। নক্ষত্রগুলি সূর্যের তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে, তাই এতো ছোটো দেখায়। অর্থাৎ তারা-গুলি সূর্যের মতো, কোনোটি সূর্যের চেয়ে ছোটো, কোনোটি আবার সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বড়ো।

এদের সঙ্গে আমাদের প্রধান যোগাযোগ আলো দিয়ে। ওদের আলো-আসে তাই ওদের দেখতে পাই। কার কেমন আলো তা জানতে পারলে সূর্য-তারকাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারা যায়। এই বিজ্ঞানকে বলা যায় জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স।

প্রায় একশ বছর থেকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের আলো বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। তিন-কোণা কাচ বা প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে আলো ভেদ করে গেলে রঙে রঙে আলাদা হয়ে পড়ে। মোমবাতির

আলো, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, সূর্যর আলো, তারার আলো,—সব আলোই এই রঙের স্তরে আলাদা বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। এই রঙের স্তরকে বলে বর্ণছত্র বা বর্ণালী, ইংরেজাতে বলে স্পেকট্রাম। সব আলোরই নিজস্ব বর্ণালী আছে, রঙের পরিমাণ আলাদা। সূক্ষ্ম বর্ণালী যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যায়, রঙের স্তর বরাবর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রঙের দাগ আছে। এদের বলে বর্ণালী-রেখা বা স্পেক্‌ট্রাল লাইন। এই সব বর্ণালী-রেখা দেখে বোঝা যায় কী কী মৌলিক উপাদান [যেমন : লোহা ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি] জ্বলে এই, সব রঙিন আলো আসছে। আমরা যেমন গলার স্বর দিয়ে মানুষ চিনতে পারি, রঙের স্তর বা বর্ণালী রেখা দিয়ে তেমনি জ্বলন্ত বস্তুর উপাদান বা মালমশলা বুঝতে পারি।

মেঘনাদ কলেজে পড়বার সময় এসব কথা কিছু কিছু পড়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের নানা বই তিনি পড়তে ভালবাসতেন। বিজ্ঞান কলেজে পড়াতে পড়াতে আলোকবিজ্ঞান ও বর্ণালী বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক গেলো। যা ধরবেন তা তন্ন-তন্ন করে বুঝে ছাড়বেন, এই ছিল মেঘনাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। যদি রিসার্চ করতে হয় তাহলে আগে জেনে নিতে হবে, পড়ে নিতে হবে সেই বিষয়ে সবটা। মেঘনাদ পড়তে লাগলেন।

মাথায় ঢুকলো : সূর্য্যের বর্ণালী। বিদেশের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরা যন্ত্র দিয়ে সূর্যের বর্ণালী পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে এমন কতকগুলি আলোর রেখা পাওয়া যাচ্ছে যার

কেউ কূলকিনারা করতে পারছেন না। বিজ্ঞানের সাধক মেঘনাদের মাথায় ঘুরতে লাগলো : তাই তো, এমন ব্যাপার কী ক'রে ঘটছে সূর্যের মধ্যে!

প্রথমে ঠিক করলেন, দেখি কতো দূর কে কী বলেছে এ সম্বন্ধে। বিলেতের রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় এ বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। ভালো কথা, তাহলে সব পড়ে দেখা যাক। আর কোনো কথা নয়। পঁচিশ বছরের ঐ বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্র একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে ফেললেন। মনে করো, তিনশোটা বই!

তারপর ভাবতে লাগলেন, অঙ্ক কষতে লাগলেন। বাস্। বেরিয়ে গেলো সমাধান। সাহা বললেন : সূর্যের প্রচণ্ড তাপে আর চাপে ভেতরের অণুপরমাণুর এক বিপর্যয় ঘটেছে, যেমনটি কয়লার আগুনে বা সাধারণ বিদ্যুতের আলোতে হওয়া সম্ভব না। সূর্যের পিঠে ও ভেতরে নানারকম ধাতু ও গ্যাসের পরমাণু এই অভাবনীয় রকমে বিদ্যুৎ-যুক্ত বা আয়নিত (ionised) হবার ফলেই সূর্যের বর্ণালীতে এই রকম সমস্যাজনক বর্ণরেখা পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যের ওপর পিঠে বা ভেতরে কোন কোন জিনিষ কী ভাবে আছে তা ডক্টর সাহার এই তাপীয়-আয়ন তত্ত্ব (thermal ionization theory) থেকে জানা গেলো।

আয়ন (ion) কাকে বলে? কথাটা বাঙলা শব্দ নয়। যে কোনো পরমাণু আয়নিত (ionized) হতে পারে। আয়নিত হওয়া মানে পরমাণুটি ধনবিদ্যুৎ-যুক্ত

হওয়া। যে কোনো পরমাণু ধনবিদ্যুৎ (পজিটিভ বিদ্যুৎ) ও ঋণবিদ্যুৎ (নেগেটিভ বিদ্যুৎ) কণা দিয়ে তৈরী। মধ্যে থাকে ধনবিদ্যুতের কণা একত্রে দলা পাকিয়ে; একে বলে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে ঋণবিদ্যুৎকণাগুলি, যাদের বলে ইলেক্‌ট্রন। যেন পরমাণুটি একটি ছোট্ট সৌরজগৎ। সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে সূর্য, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহরা। তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে ইলেক্‌ট্রনরা। পরমাণুর মধ্যে দু জাতের বিদ্যুৎ সমান সমান থাকার ফলে পরমাণুটি সাধারণ অবস্থায় থাকে—বিদ্যুৎহীন বা নিউট্রাল। কিন্তু বিদ্যুৎ বা তাপের প্রভাবে একটা দুটো করে ইলেক্‌ট্রন ছুটে যেতে পারে। তখন পরমাণুটির মধ্যে ধনবিদ্যুতের প্রাধান্য হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ পরমাণুটি ধনবিদ্যুৎ যুক্ত হয়ে পড়ে। একেই বলে পরমাণুর আয়নিত হওয়া।

মেঘনাথ সাহা প্রমাণ করলেন সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে কী করে সূর্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লোহা ও অন্যান্য উপাদানের পরমাণুগুলি আয়নিত হয় আর তার জন্য সূর্যালোকের বর্ণালী কী ভাবে প্রভাবিত হয়। সাহার এই সূত্র দিয়ে শুধু সূর্য নয়, অন্যান্য নক্ষত্রের উপাদান রহস্যও জানা হয়ে গেলো। কারণ নক্ষত্ররাও সূর্য্যের মতোই বিরাট বিরাট জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে ১৯২০ সালে ডাঃ সাহার এই তথ্য ছাপা হলো।

ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বললেন : এতোদিনে বুঝলাম ব্যাপারটা কী!

এতেই হলো মেঘনাদ সাহার সবচেয়ে প্রথম সবচেয়ে বেশি নাম। তাঁর বয়স তখন মাত্র সাতাশ। এই বয়সেই তিনি বিশ্বখ্যাতি পেলেন। আর সাত বছর পরে, ১৯২৭ সালে—তখন তিনি দেশে ফিরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন—বিলেতের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ঐ সোসাইটির সদস্য করে নিলো। ডক্টর মেঘনাদ সাহা হলেন এফ্. আর. এস্—অর্থাৎ 'ফেলো অব্ দি রয়্যাল সোসাইটি।'

ইয়োরোপে

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও গুরুপ্রসন্ন ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার ডক্টর মেঘনাদ সাহা বিলেত চললেন, রিসার্চ করতে, সেরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করতে, জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে। জাহাজে সহযাত্রীদের মধ্যে কে ছিলেন? শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। আরো ছিলেন কয়েকজন বাঙালী অবাঙালী, যাঁরা পরে নাম করেছেন।

লণ্ডনে পৌঁছে মেঘনাদ সাহা বুঝলেন অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে থাকতে গেলে খরচে কুলবে না। গেলেন বন্ধুবর স্নেহময় দত্তর কাছে, তিনি তখন লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রির জন্য রিসার্চ করছেন। তিনি

সাহাকে ভালো পরামর্শ দিলেন। বললেন : অধ্যাপর ফাউ-লারের সঙ্গে এখানে একবার কথা বলে দেখো।

অধ্যাপক ফাউলার নাম করা বিজ্ঞানী। বর্ণালী-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানে পণ্ডিত। ডাঃ সাহারও ঐ দিকে ঝোঁক। ডাঃ সাহার সঙ্গে আলোচনা করে ফাউলার সাহেব খুব খুশি হয়ে ওঁর গবেষণাগারে ডাঃ সাহাকে নিয়ে নিলেন। ডাঃ সাহা তখন নক্ষত্রের বর্ণালী সম্বন্ধে আগেকার লেখা প্রবন্ধকে আরো ভালো করে বাড়িয়ে নতুন করে লিখতে লাগলেন। অধ্যাপক ফাউলার তাঁর নিজের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর সুযোগ্য ভারতীয় ছাত্রকে অবাধে খুলে দিতে একটুও ইতস্তত করেন নি।

বর্ণালী বিজ্ঞানে মেঘনাদের অনেক জ্ঞান বেড়ে গেলো। নিজের মতবাদ—সূর্যের তাপীয় আয়নের থিওরির—ভিত্তি আরো দৃঢ় হলো। কিন্তু মনের মধ্যে একটা বাসনা যেন অপূর্ণ রয়ে গেলো। মেঘনাদ ভাবতে লাগলেন : তাপীয় আয়নের ব্যাপারটা ল্যাবরেটরিতে হাতেকলমে পরখ করে দেখলে হয় না? অধ্যাপক ফাউলারের কাছে মনের ইচ্ছা ভেঙে বললেন। কিন্তু ঠিক ঐ ধরনের সরঞ্জাম সেখানে নেই। তাহলে কী উপায়? গেলেন খোঁজনিতে কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরিতে। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী জে, জে, টমসনের সঙ্গে একঘণ্টা ধরে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। কিন্তু সেখানেও ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি নেই।

ফিরে এসে ফাউলারকে সব বললেন। ডাঃ সাহার

প্রবল ইচ্ছা, তাঁর নিজের থিওরি হাতেকলমে যাচাই করে দেখা। যদিও সূর্য-তারকার আলোর মধ্যে তাঁর থিওরির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তবু সাহা সন্তুষ্ট নন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

অধ্যাপক ফাউলার বুঝলেন। সাহার একাগ্রতা দেখে খুশি হলেন। একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। ভেবে বললেন, অধ্যাপক নার্নস্ট-কে লিখে দেখো জার্মানিতে। দেখো সেখানে কিছু বন্দোবস্ত হতে পারে কিনা।

এদিকে অন্য একজন বিজ্ঞানী, ম্যাকলেনান, সাহার তাপ আয়ন নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। পারদ বাষ্পকে গরম করে দেখবার চেষ্টা করলেন সাহার মতবাদ অনুযায়ী তেমন বর্ণালী আসে কিনা। কিন্তু কিছুই দেখা গেলোনা। ম্যাক-লেনান ভাবলেন, সাহার থিওরিতে বোধহয় কোথাও গলদ আছে। ডাঃ সাহা জানতে পেরে বললেন, ওতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার থিওরিতেই বলে পারদ বাষ্পকে উত্তাপ দিয়ে আয়নিত করা ভীষণ কঠিন। ক্ষার জাতীয় উপাদান দিয়ে করলে সহজ হবে, যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি। পরে মেঘনাদ আর-এক প্রবন্ধে লিখলেন' ম্যাক-লেনানের অসাফল্যে নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। কোনো কোনো উপাদান, যেমন পারদ, আয়নিত করতে প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তা ল্যাবরেটরিতে করা প্রায় অসম্ভব। তেমনি আবার অন্য কতগুলি উপাদান আছে যাদের উত্তাপ দিয়ে আয়নিত করা খুবই সহজ। শুধু তাই নয়, রুবিডিয়াম ও

সীজিয়াম ধাতু এতো সহজে এতো বেশি আয়নিত হয় যে তাদের কতোকগুলি চরিত্রগত বর্ণালী রেখা সূর্যের আলোতে দেখতেই পাওয়া যায় না। সাহা আরও বললেন : হয়তো সৌর কলঙ্কের আলোর বর্ণালীতে ঐ সব রেখা পাওয়া যাবে, কারণ সৌর কলঙ্কে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অল্প।

সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। মাসখানেক পরে আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে চিঠি এলো। অধ্যাপক হেনরি নরিস রাসেল লিখছেন সাহাকে : তোমার কথাই ঠিক। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দূরবীন দিয়ে সৌরকলঙ্কের বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখলাম, তুমি যা বলেছো তাই ঠিক।—তখন ডাঃ সাহা জার্মানিতে অধ্যাপক নার্নস্ট-এর ল্যাববরেটরিতে চলে এসেছেন।

এ সময় জার্মানদের মনমেজাজ মোটেই ভালো ছিলো না। যুদ্ধে পরাজিত। ইংরেজদের ওপর বেজায় চটা। স্কুল-কলেজে ইংরেজ ও আমেরিকান ছাত্রদের ঢুকতে দেয় না। শুধু ইংরেজদের ওপর চটা তাই নয়, ইংরেজদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আর যারা ইংরেজের সঙ্গে মিলে জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তাদের সবার ওপরই। সম্প্রতি নার্নস্ট সাহেবই কয়েকজন ইংরেজ ও আমেরিকান ছাত্রদের ল্যাবরেটরিতে ভর্তি করতে নারাজ হয়েছেন।

কিন্তু ডাঃ সাহার সঙ্গে কথা বলে অধ্যাপক নার্নস্ট খুব খুশি হলেন। সাহাকে তাঁর ল্যাবরেটরির সমস্ত সুবিধা ছেড়ে দিলেন—তাপ-আয়ন থিওরি হাতেকলমে পরীক্ষা করবার

জন্য। এক বছর খেটে যন্ত্রপাতি তৈরী হলো, তাপ-আয়নের পরীক্ষা শুরু হলো। অন্যান্য জার্মান ছাত্ররা এবং শিক্ষকরাও ডাঃ সাহাকে সাহায্য করতে ও উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই গবেষণায় সাহা কিছু সুফল পেলেন। কিন্তু ঠিক মনের মতো হলো না। আরো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কিন্তু কাজে বাধা পড়লো।

কলকাতায় ফিরতে হলো

কলকাতা থেকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ডক্টর সাহাকে টেলিগ্রামে ডেকে পাঠালেন। জার্মানি থেকে দেশে ফিরে আসতে হলো তাড়াতাড়ি। কী ব্যাপার?

পাঞ্জাবের খয়রা স্টেটের গুরুপ্রসাদ সিং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা দিয়েছেন। সেই টাকায় একটি ফিজিক্সের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে গড়ছেন। মেঘনাদকে ডেকেছেন নতুন 'খয়রা অধ্যাপকের' পদে যোগ দেবার জন্য।

ভালো কথাই। কিন্তু তখনকার বাঙলা সরকার আশুতোষের এই উৎসাহ, এই ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির মূলে কুঠারঘাত করতে চাইলো। অধ্যাপক নিয়োগ করবার জন্য সুদূর খয়রা স্টেটের রাজকুমার টাকা দিলেন; মেঘনাদ সাহার মতো অধ্যাপক পাওয়া গেলো। এখন গবেষণার

জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি এবং সহকারী দিতে হয়। তার জন্য টাকা কই? আশুতোষ বাঙলা সরকারের কাছে টাকা চাইলেন। কিন্তু পেলেন না। মেঘনাদ সাহাকে পেয়েও তাঁর বিভাগে রিসার্চ চালানো দুরূহ হয়ে উঠলো। ডাঃ সাহাও দেখলেন এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো অসম্ভব। ব্রিটিশরাজ বিমুখ হলে পরাধীন দেশে আমাদের আর কী উপায় আছে? আশুতোষ হাল ছাড়লেন না, গবর্মেণ্টের সঙ্গে যুঝতে লাগলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য।

কিন্তু সময় বয়ে যায়। মেঘনাদ সাহা অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, যেখানে রিসার্চের সুবিধা হতে পারে।

আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ সাহাকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করতে চাইলো। বেনারসে তখন ডাঃ ভাটনগর কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক হয়েছেন, বিলেত থেকে ফিরে। তাঁর খুব ইচ্ছা বন্ধু সাহা বেনারসে আসেন। কিন্তু ডাঃ সাহার কোনোটিই মনঃপূত হলো না, কারণ তিনি দেখলেন ওই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বিশেষ নেই!

বিজ্ঞানই তাঁর সাধনা। যেখানে গেলে বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাঘাত হবে সেখানে শুধু চাকরির জন্য তিনি যাবেন কেন? এই কারণেই তিনি আর-একটি ডাক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সার গিলবার্ট ওয়াকার ছিলেন তখন ভারতের ডিরেক্টর অব অবজারভেটরীস, অর্থাৎ আবহাওয়া বিভাগের ডিরেক্টর। এই বিভাগের অধীনে দক্ষিণ ভারতে কোডাইকানালে একটি সুন্দর ও নামকরা

মানমন্দির (observatory) আছে। সেখানে ভালো দুরবীন ও সূর্য-নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণের যন্ত্রপাতি আছে। পাহাড়ের ওপর সুন্দর হ্রদের ধারে এই সৌর-মানমন্দির। ওয়াকার সাহেব ডাঃ সাহাকে বললেন : এখানে চাকরি নাও, তোমার অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষণার সব সুবিধা করে দেবো।

দেখতে গেলে এটা একটা মস্ত সুযোগ ও সম্মান। মাইনেও ভালো। কিন্তু ডাঃ সাহা শুধু সৌর-বিজ্ঞানে সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা ব্যয় করতে চাইলেন না। বিজ্ঞানের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে যেতে চাইলেন না।

এলাহাবাদে

ভেবে দেখলেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ভালো। বন্ধু ডাঃ নীলরতন ধর ওখানে বছর দুই ধরে কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক হয়ে আছেন, এবং রিসার্চের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন।

প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হয়ে এহালাবাদে গিয়ে (১৯২৩) ডাঃ সাহা দেখলেন যেমন আশা করেছিলেন তেমন নয়। তাঁর ফিজিক্স বিভাগের অবস্থা বেশ নৈরাশ্যজনক। ছোটো একটি লাইব্রেরি, তাতে পুরোনো ছাতাপড়া কয়েকটি বই। ল্যাবরেটরিতে গবেষণার যন্ত্রপাতি নেই। যন্ত্রপাতি তৈরী

করে নেবারও উপায় নেই, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো কারখানা নেই। যেটি আছে সেটি নামেমাত্র। কয়েকজন মিস্ত্রি আর কয়েকটি হাত-যন্ত্র নিয়ে কারবার। কলের যন্ত্রপাতি নেই। কলের যন্ত্রপাতি তো দূরের কথা, যন্ত্র চালানোর মতো ইলেকট্রিক কানেক্শনই নেই কারখানায়। বিজ্ঞানে রিসার্চ করতে হলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে হয়। তৈরী করতে হলে একটা ভাল কারখানা দরকার।

মেঘনাদ সাহাকে সবাই গাণিতিক-বিজ্ঞানী বা থিওরেটিক্যাল সায়েন্টিস্ট বলে জানে। কিন্তু তিনি হাতেকলমে কোন থিওরি পরখ না করে নিশ্চিন্ত হতেন না। কলকারখানার ওপর ছিলো তাঁর ভীষণ ঝোঁক। বলতেন, কলেজে কল-কারখানা না থাকলে রিসার্চের যন্ত্রপাতি হবে কোত্থেকে, আর রিসার্চ হবে কী করে? শেষের দিকে তাঁর রিসার্চ বিভাগের কারখানাগুলি বাড়ানোর ওপর এত বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন যে অনেকে মনে করেছিলো এটা বুঝি তাঁর বাতিক। কিন্তু যে-ধরনের জটিল আর বড়ো বড়ো রিসার্চের যন্ত্রপাতি তৈরী হতো তার উপযোগী কারখানা না হলে চলতো না। উনি বলতেন, এ আর এমন কি বেশি? আমেরিকায় আজ-কাল বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরী ও চালানোর জন্য শুধু বড়ো বড়ো কারখানাই দরকার হয় তা নয়, ইঞ্জিনিয়ারও দরকার হচ্ছে।

সে কথা এখন থাক। বলছিলাম এলাহাবাদের কথা।

রিসার্চের উপযোগী ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, কারখানা

তো ছিলোই না, তার উপর ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর বিরাট ভার। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে শুধু এম. এস-সি ক্লাসে জনকুড়ি ছেলেকে পড়াতে হতো। এখানে বি. এস-সি ও এম্. এস-সি—দুইই পড়াতে হতো, শ দেড়েক ছেলে। রিসার্চ করবার সময় কোথায়? শুধু গরমের ছুটির তিনমাসে যেটুকু করা যায়। আর এলাহাবাদের গরম—যেন অগ্নিকুণ্ড!

রিসার্চের যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরির বই ইত্যাদি কেনবার টাকা পাওয়া যায় না। গবমেণ্টকে বলে বলে হয়রান। স্থানীয় লোকদের ধারণা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির মতো বড়ো আর আধুনিক ইউনিভার্সিটি আর হয় না। গবর্মেণ্টেরও ঐ ধারণা। বলে, আবার টাকা কেন?

কোন রকমে চলতে থাকে। তাপ-আয়নের গবেষণা বন্ধ। রিসার্চের টাকা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ১৯২৭ সালে ডক্টর সাহা যখন এফ্.আর.এস. হলেন, তখন কর্তাদের একটু চৈতন্য হলো। সে সময় যুক্তপ্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) গবর্নর ছিলেন সার উইলিয়াম ম্যরিস। লোক ভালো, পণ্ডিত মানুষ। সার উইলিয়াম ডাঃ সাহাকে একটা অভিনন্দন পাঠালেন তাঁর এফ্.আর.এস. হওয়াতে। ডাঃ সাহা ধন্যবাদ দিয়ে চিঠির উত্তর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও লিখলেন যে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করবার মতো টাকা নেই, তাঁর কাজের অসুবিধা হচ্ছে। সেই চিঠি পেয়ে গবর্নর বছরে পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ করে

দিলেন রিসার্চ বাবদ। তবু মন্দের ভালো, দুচারজন রিসার্চের সহকারী ও ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

কিন্তু যন্ত্রপাতি কেনা হবে কোন টাকা দিয়ে? যন্ত্রপাতি না হলে রিসার্চ চলবে কী করে? আর কোনো উপায় না দেখে ডাঃ সাহা বিলেতে রয়েল সোসাইটিকে তাঁর এই অসুবিধার কথা জানালেন। দেশে টাকা মিললো না, কিন্তু বিলেতের রয়েল সোসাইটি টাকা দিলো। ১৯৩২ সালে রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে রিসার্চের যন্ত্রপাতির জন্য দেড় হাজার পাউণ্ড, মানে কুড়ি হাজার টাকা পাঠালো।

এইবার তিনি যন্ত্রপাতি তৈরি করে তাপ-আয়ন বিষয়ে গবেষণায় হাত দিলেন। 'এই গবেষণা করে তিনি আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন? বারো বছর আগে। সুযোগ মেলেনি, কিন্তু একদিনের জন্যও সে কথা ভোলেন নি। বরাবর চেষ্টা করেছেন। বারো বছর চেষ্টা করে ফল পেলেন। এই কর্মনিষ্ঠা ধৈর্য ও অধ্যবসায় হলো মেঘনাদ সাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব।

তাপ-আয়নের গবেষণা চলতে লাগলো। কয়েকজন সুযোগ্য সহকারীও পেলেন। গবেষণার ফলাফল মনমতো হতে লাগল।

তাছাড়া বায়ুস্তরে আয়ন-মণ্ডলের ব্যাপার নিয়েও ডাঃ সাহা গবেষণা করতে শুরু করলেন। খুব উঁচুতে,—মাটি থেকে একশ দেড়শ মাইল ওপরে,—বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি আয়ন-স্তর আছে। আয়ন-স্তর মানে বিদ্যুৎওয়ালা বাতাসের স্তর। এর

ওপরে বাতাস খুব লঘু, আর বাতাসের অণুপরমাণু অল্পবিস্তর আয়নিত হয়। আয়ন কাকে বলে আগেই বলেছি। অণুপরমাণুতে বিদ্যুৎযুক্ত হলে তাকে বলে আয়নিত হওয়া। বায়ুমণ্ডলে যেখানে এমন বিদ্যুৎযুক্ত বাতাস আছে সেই স্তরকে আয়নমণ্ডল বা Ionosphere বলে। এই সব আয়নমণ্ডল থেকে রেডিও তরঙ্গ কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। বেতার-বার্তা পাঠানোর ব্যাপারে আয়নমণ্ডলের জ্ঞান খুব জরুরী।

আবার কলকাতায়

এলাহাবাদ ছেড়ে ১৯৩৮ সালে ডাঃ সাহা কলকাতা ফিরে এলেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে তারকনাথ পালিতের দানে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকের পদে ডাঃ সাহা পালিত-প্রফেসর হলেন। ওদিকে এলাহাবাদে তাপ-আয়নের গবেষণা তাঁর সহকারীরা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আয়নমণ্ডলের গবেষণাও।

কলকাতায় ফিরে ডাঃ সাহা গবেষণার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। লক্ষ্য হলো আণবিক বা অ্যাটমিক বিজ্ঞান। বলে রাখি, আণবিক বিজ্ঞান বা আনবিক শক্তি এ কথা দুটির মধ্যে একটু ভুল আছে। বলা উচিত কেন্দ্রীণ বিজ্ঞান বা কেন্দ্রীণ শক্তি, যাকে বলে নিউক্লিয়ার সায়েন্স বা

নিউক্লিয়ার এনার্জি। আসলে পরমাণুর কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়ারের মধ্যেই এইসব শক্তিশালী ব্যাপার ঘটে। কিন্তু অ্যাটমিক শক্তি ও অ্যাটমিক সায়েন্স কথা দুটির চল হয়ে গিয়েছে। লিখতে বলতেও সোজা।

কলকাতা এসে কসমিক রশ্মি ও আণবিক বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বাছা বাছা কর্ম্মী নিতে লাগলেন, যন্ত্রপাতি তৈরি হতে লাগলো। আবার সেই সমস্যা। রিসার্চ চালানোর টাকা চাই : গবেষক কর্মীদের বৃত্তি দিতে হবে, যন্ত্রপাতি কিনতে হবে, কারিগর মিস্ত্রিদের মাইনে দিতে হবে। এ তাঁর চিরকালের সমস্যা। আবার টাকা যোগাড়ের ধান্ধা করতে লাগলেন। সরকার ও দেশের ধনীগুণীদের কাছে হাত পাতলেন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য।

কম খাটতে হয়েছিলো এ নিয়ে? তবে সাড়া পেলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। মাথার মধ্যে কতো রিসার্চের প্ল্যান ঘুরছে, কতো কী করবার আছে! আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের কতোটুকু চর্চা হয়? আমরা কি বিজ্ঞানে পিছিয়েই থাকবো? বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকলে দেশ কী করে এগুবে? এ যে বিজ্ঞানের যুগ। দেশের ছেলেমেয়েদের কি বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব আছে? না। বিদেশের লোকেরাই কি শুধু বড়ো বৈজ্ঞানিক হতে পারে, আমরা পারি না? ওরা কি আমাদের তুলনায় অতিমানব? না। তবে কেন পিছিয়ে থাকবো? বিজ্ঞানের সাধনা কেন এদেশে হবে না?

শুধু টাকার অভাব। বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষণার

উপযুক্ত টাকার অভাব। এদেশের লোকেরা, ব্যবসায়ীরা, সরকার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাদের জাগাতে হবে। দেশের লোকেদের সুখসুবিধা ও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে বিজ্ঞানের উন্নতি চাই। সরকারের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা চালাতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে গেলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা চাই। বিদেশের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দান করে; সে দেশের সরকার কতো কতো টাকা রিসার্চের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করে! আমাদের দেশে সে ভাবধারা কোথায়? তার ওপর একদল লোক আছেন যাঁরা ভাবেন আমরা বেশ আছি, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি কী গৌরবময়, বেদের কথাই চরম কথা। কিন্তু যুগ বদলায়, মানুষের ভাবধারা বদলায়, মানুষ এগিয়ে চলে। প্রাচীনপন্থীদের ডাঃ সাহা ঠাট্টা করে বলতেন, সবই ব্যাদে আছে, কী বলো? আমাদের আর কী ভাবনা!

নূতন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দেশে আনবার জন্যে ডাঃ সাহা উঠেপড়ে লাগলেন। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়ে প্রথমে শুরু করলেন কসমিক রশ্মির গবেষণা। কস্‌মিক রশ্মি ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে। কত কী ঘটছে এদিয়ে তা বলা মুশকিল। এই আলো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যন্ত্র দিয়ে ধরা যায়। কোথা থেকে কী ভাবে এই রশ্মি সৃষ্টি হচ্ছে, কেউ জানে না। সব দেশে এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে।

আকাশ থেকে এই রশ্মি আসছে অনবরত, দিনে রাতে এসে পড়ছে পৃথিবীতে। চোখে দেখা না গেলেও এই রশ্মি খুব শক্তিশালী। কস্‌মিক রশ্মির কোনো কোনো অংশ এক্স-রের মতো, লোহা লক্কর ইটপাটকেল ভেদ করে যায়। আবার কোনো কোনো অংশ রেডিয়ামের আলোর মতো, বিদ্যুৎ-কণা দিয়ে তৈরী। আকাশের চতুর্দিক থেকে আসছে, তাই নাম দেওয়া হয়েছে কস্‌মিক রশ্মি বা ব্যোম জ্যোতি। কস্‌মিক রশ্মি বাতাসে ধাক্কা দিয়ে বাতাসকে আয়নিত করে বাতাসে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আরো অনেক ব্যাপার।

কস্‌মিক রশ্মি আকাশ থেকে যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বাতাসের ধাক্কায় তার জোর ক্রমশ কমতে থাকে। যতো মাটির কাছে আসে ততোই নিস্তেজ হতে থাকে। ডাঃ সাহা দুজন সুযোগ্য সহকারী ডাঃ নীরজনাথ দাশগুপ্ত ও ডাঃ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে সাত হাজার ফুট ওপরে একটা কস্‌মিক রশ্মির জন্য লেবরেটরি তৈরী করলেন। মাস দুই ধরে কসমিক রশ্মির মাপযোপ করে আবার কলকাতা ফিরে এলেন।

আসল আণবিক বিজ্ঞানের গবেষণা করতে হলে চাই আধুনিক যন্ত্র সাইক্লোট্রন। সে এক বিরাট যন্ত্র, ওজনে হাজার মন, দাম কয়েক লক্ষ টাকা। কত রকম যন্ত্রপাতি লাগানো তার সঙ্গে। তার মধ্যে চালানো হবে পঞ্চাশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ। এই যন্ত্র দিয়ে পরমাণু চূর্ণ করা হবে, পরমাণুর মধ্যের নিউক্লিয়াসকে জোরালো বিদ্যুৎ-কণার

গুঁতো মেরে পরমাণুর স্বভাব বদলে দেওয়া হবে, সাধারণ ধাতু থেকে তৈরী হবে রেডিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এমন যন্ত্র পেলে অ্যাটম ও কেন্দ্রীণ সম্বন্ধে কত কী জানা যাবে। স্বাভাবিক রেডিয়ামের বদলে এই সব কৃত্রিম রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্‌ ধাতু দিয়ে রোগের চিকিৎসা হবে, রোগের কারণ নির্ণয় করা যাবে। সাইক্লোট্রন চাই!

কিন্তু এতো টাকা কই? পণ্ডিত নেহরুকে ধরে বোম্বাইয়ের টাটা এণ্ড সন্স থেকে ষাট হাজার টাকা যোগাড় করলেন। সরকার থেকেও কিছু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু টাকা বরাদ্দ করল। ওদিকে এলাহাবাদের ছাত্র ডাঃ বাসন্তী-দুলাল নাগ চৌধুরী আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি ডাঃ লরেন্স-এর কাছে আণবিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। ডাঃ সাহা ডাঃ নাগকে ভার দিলেন সাইক্লোট্রন তৈরির বিষয়টা শিখে আসতে আর যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করে দিতে। অধ্যাপক লরেন্সই হলেন সাইক্লোট্রন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। ঠিক হলো, সাইক্লোট্রনের প্রধান প্রধান অংশ গুলি আমেরিকা থেকে করিয়ে আনা হবে ডাঃ নাগের তত্ত্বাবধানে।

ক্রমে ক্রমে সাইক্লোট্রনের যন্ত্রপাতি যোগাড় হতে লাগলো। কিন্তু ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বেধে সব পিছিয়ে দিলো। শুধু যে জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তা তাই নয়, খবরা-খবর আদান প্রদানেরও খুব অসুবিধা হতে লাগল। ডাঃ সাহা ব্যস্ত হয়ে আমেকিায় চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন, সাইক্লোট্রন

যন্ত্রের পার্টস্ কেনার জন্য আণবিক বিজ্ঞানের কোথায় কী নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে জানবার জন্য।

এতে হলো এক মহা বিপদ। আমেরিকা তখন অ্যাটম বোমা বানাতে চেষ্টা করছে। আমেরিকায় সরকারের তত্ত্বাবধানে এই সব অ্যাটম বিজ্ঞানের গবেষণামূলক কার্যকলাপ চলছে গোপনে গোপনে। আমেরিকারও সাধারণ লোকেরা জানে না কোথায় কী হচ্ছে। শুধু অ্যাটম বিজ্ঞানীরা চুপি চুপি সরকারী গবেষণাগার ও অ্যাটম কারখানায় কাজ করে চলেছে। তাদের ওপরও কড়া নজর, কড়া পাহারা। খবর্দ্দার, এসব খবর বাইরে না বেরোয়। কেউ জিজ্ঞেসা করতে পারে না। করলেই পুলিস গোয়েন্দা সন্দেহ করবে, শত্রুপক্ষের গুপ্তচর না তো?

ডাঃ সাহা এসব ব্যাপার জানেন না। সমানে আমেরিকায় চিঠিপত্র লিখে চলেছেন, সবার কাছে খোঁজ-খবর চাইছেন। এই দেখে তাঁর এক আমেরিকান বিজ্ঞানী বন্ধু ডাঃ সাহাকে ব্যাক্তিগত ভাবে সাবধান করে দিলেন।

এর পর যখন ডাঃ সাহা ও অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আমেরিকা গেলেন, ১৯৪৪ সালে, তখনও যুদ্ধ থামে নি। আমেরিকান সরকার এঁদের জন্য দেশ পরিভ্রমণের ছক তৈরী করে দিল, তার মধ্যে আণবিক গবেষণাগার দেখা প্রায় সবই বাদ পড়ল। পুলিশ গোয়েন্দারা এঁদের ওপর নজর রাখল, বিশেষ করে ডাঃ সাহার ওপর।

আমেরিকা থেকে ফিরবেন, এমন সময় ওয়াশিংটনে দুজন

আমেরিকান পুলিশ গোয়েন্দা ডাঃ সাহার সঙ্গে দেখা করতে এলো, মানে জেরা করতে এলো। কথা বলে গোয়েন্দারা তো অবাক। এই ভারতীয় লোকটি অ্যাটম বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত জানে, আর নাকি নিজেও পরমাণু বিজ্ঞানে নানা তথ্য লিখেছে? অনেক জেরা করে তবে নিশ্চিন্ত হলো যে ডাঃ সাহা অ্যাটম বোমার কলকাঠি কিছু জেনে যেতে পারেন নি। আমেরিকায় তখন হাজার হাজার বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি এটম বোমা তৈরি করবার কাজে লেগেছে। আমেরিকান সরকার অ্যাটম বোমা রিসার্চের জন্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে! বিরাট ব্যাপার। কিন্তু সবাই মুখ বন্ধ রেখেছে, কাউকে কিচ্ছুটি বলছে না কোথায় কী হচ্ছে।

যাই হোক, অবশেষে ডাঃ নাগচৌধুরীর তত্ত্বাবধানে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে সাইক্লোট্রন বসল, ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র। কত কলকব্জা এই বিরাট যন্ত্রের মধ্যে। এর হাই-ভোল্ট ইলেক্‌টিক যন্ত্রপাতি লাগানোর ভার নিলেন ডাঃ বিন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। রেডিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থর গুণাগুণ পরীক্ষা করবার ভার নিলেন ডাঃ সাহার সুযোগ্য পুত্র ডাঃ অজিত কুমার, এবং অন্যান্য সহকারীরা।

অ্যাটম বিজ্ঞান বা কেন্দ্রীণ বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও সাইক্লোট্রনের আর একটি জনকল্যাণকারী দিক আছে। আগেই বলেছি, এ দিয়ে সাধারণ জিনিসকে—যেমন আইয়োডিন, ফস্‌ফরাস, রুপা ইত্যাদি—রেডিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয়

উপাদানে পরিণত করা যায়। তাহ'লে ক্যান্সার, টিউমার, গলগণ্ড, লিউকেমিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হতে পারবে, আর নানা রোগের কারণও নির্ণয় করা যাবে। অমনি ডাঃ সাহা কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। রোগী আসতে লাগল চিকিৎসার জন্য, চিকিৎসার ফলাফল নির্ণয়ের জন্য।

শুধু এতেই কি শেষ? চিকিৎসা-শাস্ত্র চালাতে হলে চাই মাইক্রোস্কোপ। রোগভোগের জন্য রক্তের মধ্যে কী বিপর্যয় ঘটে, রোগের জীবাণু কী ধরনের এবং কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে বাসা বাঁধে,—এ সব অনু-বীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা দরকার। এক-এক রকম রোগের জীবাণু আছে যাদের বলে ব্যাক্টেরিয়া। এদের চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়। আর-এক রকম বীজাণু আছে সেগুলি আরো ছোটো। এদের বলে ভাইরাস (virus), ডাক্তারখানার সবচেয়ে জোরালো মাইক্রোস্কোপ দিয়েও এদের দেখা যায় না। তাদের দেখতে হলে চাই আরো জোরালো মাইক্রোস্কোপ, বিশেষ ধরনের অনুবীক্ষণ। এই বিশেষ ধরনের মাইক্রোস্কোপকে বলে ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ। এ দিয়ে জীবাণুর ছবি তোলা যায় এক লক্ষ গুণ বড়ো করে।

তাহলে ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ চাই। কিন্তু টাকা? ডাঃ সাহা ভাবতে লাগলেন। আবার যে লাখ টাকার ধাক্কা!

তাছাড়া ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ বসাতে জানে, চালাতে জানে, এমন লোক এদেশে কই ? ভারতবর্ষে তো একটাও ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি হয়নি, বিদেশ থেকে আমদানিও হয়নি। ডাঃ সাহা দমলেন না। ভাবলেন, সব করে নেওয়া যাবে, শিখে নেওয়া যাবে।

পাঠালেন ডাঃ নীরজ দাশগুপ্তকে আমেরিকায়। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক মার্টনের কাছে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের কলকব্জা শিখতে লাগলেন, যন্ত্র তৈরির জন্য নকশা বানাতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে যন্ত্র তৈরি হতে লাগলো। ডাঃ মার্টিন হচ্ছেন ইলেক্ট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কর্তা।

একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। ডাঃ সাহা সাইক্লোট্রন শিখবার জন্য একজনকে পাঠালেন সাইক্লোট্রনের আবিষ্কর্তার কাছে, আর ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপ শিখতে আর একজনকে পাঠালেন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কর্তার কাছে। ভালো করে শিখতে হলে আসল গুরু চাই, এই হচ্ছে কথা। ডাঃ সাহার চিন্তাধারায় বা পরিকল্পনায় কখনো আধা-খাপছাড়া ব্যাপার থাকতো না। যা করতে হবে তা সবচেয়ে ভালো ভাবে করতে হবে।

সবই ভালোভাবে শুরু হলো। কিন্তু ইলেক্ট্রন মাইক্রো-স্কোপের টাকা আসবে কোথা থেকে ? ডাঃ সাহা আবার ভিক্ষের ঝুলি উঠিয়ে নিলেন। ঝুলি খালি রইলো না। স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ষাট হাজার টাকা

ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে দান করলেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও সমান টাকা বাঙলা সরকারের তরফ থেকে বরাদ্দ করলেন। তাছাড়া জমিদার বিমলাচরণ লাহা, বিড়লা কোম্পানি……এঁরাও দান করলেন। বায়োফিজিক্স বিভাগ (Institute of Biophysics) স্থাপন হয়ে গেলো। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈর করে আনলেন ডাঃ দাশগুপ্ত। এই হলো ভারতে প্রথম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ। পরে বিভাগের কাজ চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কিছু টাকা পাওয়া গেলো।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও বায়োফিজিক্স,—দুটো বড়ো বড়ো বিভাগ কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে স্থাপন হয়ে গেলো। কোথা থেকে কী করে সব হলো এখন ভাবলে মনে হয় যেন ভেল্কিবাজি। এর মূলে রয়েছে মেঘনাদ সাহার অশেষ দূর-দর্শিতা, অফুরন্ত উদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রম আর অপরাজেয় কর্মনিষ্ঠা।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানে

বিজ্ঞানের চরম পরিণতি মানুষের সুখ-শান্তি জোগানোর কাজে। পুরাকালে মানুষ সব কাজ করতো হাত দিয়ে, শরীরের শক্তি দিয়ে। তখন কলকারখানা ছিলো না। বড়োলোকরা রাজরাজড়ারা মানুষ কিনে নিতো। সেই ক্রীতদাসদের শরীরের পরিশ্রম দিয়ে সব কাজ চলতো। দূর দেশে যেতে হলে গোরুরগাড়ি, ঘোড়া, হাতি, উট সম্বল। তারপর এলো বিজ্ঞানের যুগ। এলো ষ্টীম এঞ্জিন, কলকারখানা, বিদ্যুৎ-শক্তি। ক্রীতদাসের প্রয়োজন চলে গেলো, ক্রীতদাসরা মুক্তি পেলো।

বিজ্ঞান এগিয়ে চললো। মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ-চালিত কলকারখানা, ইস্পাত, টেলিফোন, ছাপাখানা, রেফ্রি-জারেটার···। কতো বলব? সবই তো বিজ্ঞানের দান। এটা বিজ্ঞানের যুগ। যেদিকে তাকাও সবকিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের কারসাজি। যে দেশ যতো বিজ্ঞানের চর্চা করছে, বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে খাটাচ্ছে, সে দেশ ততো উন্নত, সে দেশের লোকেরা খাওয়া-পরার অভাব থেকে ততো মুক্ত, সে দেশের ছেলেমেয়েরা ততো হাসিখুসি, দেশে রোগভোগ ততো কম।

বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো। হ্যাঁ, সেও বিজ্ঞানের এক

দিক। তাকে বলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান। যন্ত্রপাতি তৈরি করার জ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ইস্পাত তৈরি করা ব্যবহারিক বিজ্ঞান, নদীকে বাঁধ দিয়ে বাঁধা ব্যবহারিক বিজ্ঞান,···আরো কতো কী। এঞ্জিনিয়ারিং হলো একজাতের ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

এই সব ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মূলে আছে শুদ্ধ বিজ্ঞান বা pure science, যার ওপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। ধরো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছো। ক্যামেরা তৈরি হয় কারখানায়। ক্যামেরা শিল্প বা ইন্‌ডাস্‌ট্রি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দান। কিন্তু এই ব্যবহারিক বিজ্ঞান কী করে এলো? তার গোড়ার কথা কী? লেন্স দিয়ে ছবি সৃষ্টি হয়। কী করে হয়? আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে গেলে আলো আর লেন্সের কাচের গুণাগুনের ওপর ছবি সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করছে। তাহলে আলো আর কাচের সম্পর্ক কী? এই তো গোড়ার বিজ্ঞানের কথা বা শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা এসে পড়লো। তারপর প্রশ্ন হতে পারে, ফোটো-ফিল্মের ওপর ছবির ছাপ পড়ে কেন? উত্তর হবে, এক রকম কেমিক্যাল মাখানো থাকে বলে। কী কেমিক্যাল? কেন ওটা আলো লাগলে কালো হয়? আবার কেমিস্‌ট্রির মূল কথা এসে পড়লো, শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা এসে পড়লো, যার সঙ্গে আপাতত ক্যামেরার কোনো সম্পর্ক নেই।

এখন বোঝা গেলো, বিজ্ঞানকে কাজে খাটাতে গেলে রিসার্চ করে বের করতে হবে কী কী উপায়ে তা খাটানো যায়। একেই বলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রিসার্চ।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা কম, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চর্চা আরো কম। দেশে শিল্প কারখানাও কম। তাই দেশ গরীব।

মেঘনাদ সাহা ভাবলেন, এ ভাবে কী করে চলবে? দেশে যন্ত্র-বিজ্ঞান চাই, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণা চালু করা চাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। ১৯৩৮ সালের কথা বলছি। নেতাজী একটা সভাতে সভাপতিত্ব করছেন। সভার শেষে মেঘনাদ সুভাষকে প্রশ্ন করলেন: ভারত স্বাধীন হলে আমরা কি পুরাকালের মতো লাঙল চরকা গোরুর গাড়ী নিয়ে থাকবো, না যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবো? যদি যন্ত্রবিজ্ঞানে, যন্ত্রশিল্পে এগুতে না পারি তবে এ দেশ কি কখনো উঠতে পারবে? যদি ভারতের উন্নতি সাধন করতে হয় তাহলে যন্ত্রশিল্প বসাতে হবে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণা চালাতে হবে, দেশের বিজ্ঞানীদের একত্রিত করতে হবে, জাতীয় গবেষণা সংঘ স্থাপন করতে হবে, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করতে হবে।

নেতাজী উত্তর দিলেন: একথা খুব ঠিক। ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও বৃহৎ শিল্প-কলকারখানা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে না। এর জন্য প্রথমে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি স্থাপন করা দরকার। বিজ্ঞানের প্রয়োজন সবচেয়ে আগে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি (National Planning Com-

mittee) ১৯৩৮ সালে স্থাপিত হলো। জহরলাল নেহেরু হলেন এর সভাপতি। এই সমিতির কাজ নানা অংশে বিভক্ত। দেশের নানা সমস্যা বুঝতে হবে, সেই বুঝে প্ল্যান করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সাতাশটা বিভাগ। মেঘনাদ সাহা শক্তি ও ইন্ধন (Power and Fuel) বিভাগের চেয়ারম্যান হলেন। এই বিভাগের কাজ হলো বিদ্যুৎ-শক্তি, কয়লা, পেট্রোল, বা অন্যান্য জ্বালানি তেল ইত্যাদি (যা দিয়ে কল চলবে, কলকারখানার শক্তি জোগাবে) সম্বন্ধে ভারত-বর্ষের প্রয়োজন-মাত্রা অনুধাবন করা। আমাদের কতোটুকু আছে, কতোটা নেই, কতোটা দরকার—এই সব খবর জোগাড় করা, প্ল্যান করা—এই হলো এ বিভাগের কাজ।

আমাদের দেশে কতোটা বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়? খুব কম। শহরেই বিদ্যুৎ দেখি। কটা গ্রামে বিজলী আছে? আর, আমাদের দেশে গ্রামই তো বেশি। গণনা করে দেখা গেলো, ১৯৪২ সালে আমাদের দেশে মাথাপিছু বিজলী খরচ হয় ৯ ইউনিট মাত্র। তখন আমেরিকার লোকেরা মাথাপিছু পায় ১৫০০ ইউনিট করে, ইংলণ্ডে মাথাপিছু ৬৫০ ইউনিট; এমনকি অনুন্নত (তবে, স্বাধীন দেশ) মেক্সিকোও ভোগ করে মাথাপিছু .৮০ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি। আমরা মোটে ৯ ইউনিট! তবে স্বাধীন ভারতে এখন বিদ্যুৎ-উৎপাদন বেড়েছে। এখন মাথাপিছু আমরা পাই প্রায় ১৬ ইউনিট করে। মনে রেখো, এটা ভারতবর্ষের সমস্ত লোক ধরে মোটমাট বা গড়পড়তার কথা বলছি। আসলে বড়ো

শহরের লোকেরা এর চেয়ে বেশি পায়, ছোটো শহরে কম, গ্রামে পায়ই না।

সাধারণত কয়লা জ্বালিয়ে বিজলী উৎপাদনের যন্ত্র চালানো হয়। আমাদের দেশ নদীবহুল। কতো নদী, কতো জল। কতো বাড়তি জল! বন্যা! এই সব নদীকে বাঁধতে পারলে, নদীর জল ধরে রাখতে পারলে, সেই জলের চাপে জল-চাকা ঘুরিয়ে বিজলী উৎপাদনের যন্ত্র চালানো যায়। একে বলে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি। আমাদের দেশে নদী থেকে যতোটা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হতে পারে তার শতকরা মাত্র তিন ভাগ এখন উৎপন্ন করা হচ্ছে।

ন্যাশানল প্ল্যানিং কমিটির 'নদী ও সেচ' বিভাগেরও সদস্য ছিলেন ডাঃ সাহা। নদীবিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ ও পড়াশোনা বহুদিনের। মরা নদী দেশে রোগভোগ আনে, চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। পাগলা নদী দেশ-গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যার শেষে আসে মহামারী। আমাদের দেশে এমন পাগলা নদীর অভাব আছে? দামোদর, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, কোশী, মহানদী—আরো কতো। নদীনিয়ন্ত্রণ করতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির কাজ চার বছর ধরে চললো। অনেক তথ্য জোগাড় হলো। বোঝা গেলো দেশে কতোটুকু কী আছে, আর কী কী লাগবে। ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়ো" স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হলো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। তখনো ভারত স্বাধীন হয়নি। এই আন্দোলনে

বহু নেতা কারাগারে বন্দী হলেন। নেহরুও। প্ল্যানিং কমিটির কাজ বন্ধ হলো। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনার মালমশলা জোগাড় হয়ে রইলো। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছে ১৯৩৯ থেকে। একদিকে জার্মান অন্যদিকে জাপান, ছুদিক সামলানো দায়। ইংরেজ গবর্মেণ্ট তো ফাঁপরে পড়লো। বিলেতে বড়ো বড়ো কারখানা আছে, কামান, এরোপ্লেন, বোমা তৈরী হচ্ছে জার্মানি আর ইতালিকে ঠেকানোর জন্য। কিন্তু এদিকে কী করে জাপানকে ঠেকাবে। জাপান এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে, বর্মায় জাপানী বোমা পড়ছে। জাহাজে করে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসা প্রায় বন্ধ। অথচ ভারতে যন্ত্রশিল্প তখন নেই বললেই হয়। ভারতের খনিজ সম্পদ উঠিয়ে এদেশে ধাতুশিল্প বেশি গড়ে উঠেনি, ভালো জাতের ইস্পাত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি হয় না, ইংরেজ সরকার হতে দেয়নি। এবার টনক নড়লো। বিজ্ঞানের বনিয়াদ আগে শক্ত না করলে চলে না।

১৯৪০ সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ নামে একটা গবর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠান স্থাপন হলো। ডাঃ ভাটনগর এর ডিরেক্টর ছিলেন, ডাঃ সাহা ছিলেন একজন সদস্য।

ডাঃ সাহা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যন্ত্রশিল্প-বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞান কলেজের কারখানা অনেক বাড়ালেন। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি হতে লাগলো।

এখানেই একটা রেফ্রিজারেটার তৈরি হলো যার প্রায় সব অংশই তৈরী বিজ্ঞান কলেজে। একেই সর্বপ্রথম ভারতীয় রেফ্রিজারেটার বলা যায়।

নদীবিজ্ঞানে

ঢাকা জেলায় যাঁর বাড়ি, সাঁতারে যাঁর আনন্দ, তিনি নদীকে ভালবাসেন, নদী সম্বন্ধে সচেতন। আর যদি তিনি বৈজ্ঞানিক হন?—এ সব কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, মেঘনাদ নদীবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাবছিলেন বহুদিন ধরে, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে।

একটা কথা মনে পড়লো। কয়েক বছর আগে। এক শনিবারে আমাদের বললেন: কাল সকালে তোমরা কজন আমার বাড়ি এসো, কতগুলি কাজের কথা আলোচনা করবার আছে। হ্যাঁ, কিন্তু খুব সকাল-সকাল আসবে ,সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে।

ভাবলাম কী মুশকিল। কোথায় রোববার সকালে একটু গড়িমসি করে উঠব, তা আর হলো না। গরমের দিনে ভোরের দিকটাতেই তো ঘুমোতে আরাম।

রবিবার সকালে উঠে কাগজপত্র নিয়ে গেলাম। সাদার্ন অ্যাভিন্যুর ওপর বাড়ি, লেক দেখা যায়। আরো সবাই এসে পড়লো। সবাই ভাবছে এবার কী কাজের কথা উঠবে।

ডাঃ সাহা বললেন: "চলো লেকে সাঁতার কেটে আসি। আমি ক্যালকাটা লাইফ সেভার্স সোসাইটির মেম্বার, তোমরা আমার অতিথি হয়ে আসতে পারবে।"

আঃ কী মজা। খুব সাঁতার কাটা গেলো। ফিরে এসে সবাই একসাথে চা খেয়ে কাজে বসলাম।

নদীবিজ্ঞানের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম। আমাদের নদীবহুল দেশ। কিন্তু কী অবস্থা এসব নদীর? কোনোটি মজে যাচ্ছে, বুঁজে যাচ্ছে, কোনোটি আবার বন্যায় দেশ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

১৯১৩ সালে দামোদরে ভীষণ বন্যা হলো। বর্ধমান জেলার অনেক জায়গা ডুবে গেলো, মানুষ মরলো, গোরু-মোষ ভেসে গেলো, বাড়িঘর ভেঙে পড়লো, মাঠের ধান নষ্ট হলো। মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। দেশের নেতারা বন্যা রিলিফ কমিটি গঠন করলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বাঙলার যুবকদের ডাকলেন। ভলান্টিয়ার চাই, যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বন্যার্তদের সাহায্য করবে। মেঘনাদ সাহা তখন এম. এস-সি পড়ছেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক-দলে যোগ দিলেন, জলকাদা ভেঙে তাঁর দল নিয়ে চললেন।

দামোদরের বন্যার ভীষণ রূপ দেখে মেঘনাদের মনে গভীর দাগ কাটলো! এর কি কোনো প্রতিকার নেই? প্রতিকার আছে। প্রতিকারের পথ তিনিই বাতলে দিলেন। কিন্তু তা ১৯১৩ সালে নয়, ১৯৪৩ সালে। অর্থাৎ ত্রিশ বছর পরে। সেকথা পরে বলবো।

১৯২৩ সাল। উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বন্যা রিলিফের ব্যবস্থা করলেন। ব্রিটিশ গবর্মেন্টের এ নিয়ে মাথাব্যথা দেখা গেলো না, বললো, বন্যা হলো ভগবানের মার। উপায় কি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন বিজ্ঞান কলেজের একটা ঘর নিয়ে থাকেন, পড়েন, পড়ান। তিনি সবাইকে ডাকলেন স্বেচ্ছাসেবক হতে। ডাঃ সাহা স্বেচ্ছাসেবক-দলে যোগ দিলেন। তিনি তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। আরো অনেকে এগিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র চলে গেলেন সান্তাহারে, দলবল নিয়ে। ডাঃ সাহা বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা উঠলো।

উত্তর বঙ্গের বন্যা ও বন্যার প্রতিকার সম্বন্ধে ডাঃ সাহা মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন। এর পর ডাঃ সাহা আরো ভালো করে নদীবিজ্ঞানের বিষয়গুলি তলিয়ে দেখতে লাগলেন। আমাদের দেশের নদীগুলি কী ধরনের, উত্তর বঙ্গ ও উত্তর ভারতের নদীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির কী পার্থক্য, দক্ষিণ বঙ্গের নদীগুলির কী কী সমস্যা—এই সব বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন। জার্মানি, আমেরিকা, রাশিয়া—এ সব দেশে নদীবিজ্ঞানের জন্য অনেক গবেষণাগার আছে। ডাঃ সাহা ভাবলেন, আমাদের দেশেও সেরকম নদী-গবেষণাগার হওয়া উচিত, বিশেষ করে মরা-নদীর দেশ বাঙলার জন্য তো বটেই। এই সব নিয়ে তিনি ১৯৩২ থেকে লেখাপড়া করতে লাগলেন। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা—এই

সব নদীর মাটি এসে থিতিয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাঙলা দেশের মাটি তৈরী হয়েছে। বাঙলা দেশকে ব-দ্বীপ বলা হয়। এই থিতোনো মাটি ও পলি বাঙলা দেশের জমিকে উর্বর করেছে। কতো নদী! কিন্তু সব বুঁজে আসছে ক্রমশ। বাঙলা দেশ সমতল, পাহাড়ে দেশ নয়। তাই নদী চলে ধীরে ধীরে, কাদা-মাটি ফেলতে ফেলতে। তার ওপর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের জল ঢোকে, তাতে নদীর মুখে কাদামাটি জমে। অনেক সমস্যা।

ডাঃ সাহা বলেন, বাঙলা দেশের নদীনালা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, না হলে চাষবাস নষ্ট হবে, দেশ ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে যাবে। এর জন্য বাঙলা দেশে নদীবিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া দরকার। কাগজে কাগজে লিখতে লাগলেন, বক্তৃতা দিতে লাগলেন, সরকারকে খোঁচাতে লাগলেন। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলন চলো বছরের পর বছর ধরে। শেষে এর ফল হলো। বাঙলা দেশে নদী বিজ্ঞানের গবেষণার স্থাপিত হলো : রিভার রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, ১৯৪২ সালে।

১৯৪৩ সালে দামোদরের আর-এক ভীষণ বন্যার পর গবর্মেণ্টের তরফ থেকে একটা দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটি গঠিত হলো। ডাঃ সাহা এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। এই তদন্ত কমিটির কাজ হলো দামোদর বন্যার রূপ কী, কত ক্ষতি করেছে, কী প্রতিকার হতে পারে, এই সব ঠিক করা।

ডাঃ সাহা দামোদর বন্যার সমস্ত পুরাতন ইতিহাস জড়ো করলেন। আমার সৌভাগ্য আমাকে তিনি একাজে সহকারী

করে নিলেন। সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকায় ডাঃ সাহা দামোদর বন্যা নিয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পরে আর-একটা রিপোর্ট লিখলেন কী করে দামোদরকে বাগ মানানো যায়।

ডাঃ সাহা বললেন, দামোদরের মতো পাগলা নদীকে বশ করতে হলে এখানে ওখানে জোড়াতালি দিয়ে বানের জল ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে কোনো ফল হবে না। দামোদর নদীর দুপাড় বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু বানের সময় সে বাঁধ (embankment) ভেঙে যায়, জল ছাপিয়ে পড়ে, গ্রাম ভেসে যায়। পাড়-বাঁধ দিয়ে জলকে নদীর পথের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। এ সব জোড়াতালি বৃথা। নদীতেই বানের বাড়তি জল আসা বন্ধ করতে হবে। এ জন্য পাহাড়ের কোলে, যেখান দিয়ে দামোদর ও দামোদরের প্রধান উপশাখা বরাকর নদী আসছে, সেখানে নদীতে বাঁধ (dam) দিয়ে নদীকে আটকে দিতে হবে। তাহলে বর্ষার জল বাঁধে বাধা পেয়ে বিরাট হ্রদ সৃষ্টি করবে। সেই হ্রদের জল সারা বছর ধরে আস্তে আস্তে ছাড়া হবে। তাহলেই বর্ধমান জেলার বন্যা বন্ধ হবে। আর বাঁধের পিছনের হ্রদের জল দিয়ে জলচাকা (turbine) ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হবে।

অর্থাৎ নদীর আগা থেকে গোড়া অবধি সবটা নিয়ে প্রতিকারের কথা ভাবতে হবে। বাঁধ তৈরি হতে পারে বিহারের পাহাড় অঞ্চলে, বন্যা আটকাবে বাঙলা দেশে বর্ধমান বাঁকুড়া হুগলী জেলায়, জলবিদ্যুৎ সরবরাহ হবে বিহার বাঙলা

দুই প্রদেশেই। অর্থাৎ দামোদর নদী এভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে দুই প্রদেশেরই উপকার হবে।

ডাঃ সাহা বললেন, এই ভাবে দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সমস্ত নদী-উপত্যকা একত্রে প্ল্যান করতে হবে। নদী নিয়ন্ত্রণের ভার বাঙলা বিহার কোনো একটা প্রদেশকে দিলে চলবে না, নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে একটা স্বাধীন দামোদর নদী প্রতিষ্ঠানের ওপর। না হলে দুই প্রদেশ নিজের নিজের সুবিধার দিকে টানতে চাইবে, ফলে নদী নিয়ন্ত্রণ ঠিকমতো হবে না।

ডাঃ সাহা তুলনা করে দেখালেন, আমেরিকায় টেনেসী নদীর অবস্থা অনেকটা দামোদরের মতো ছিলো। টেনেসী নদী সাতটা প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান 'টেনেসী ভ্যালি অথরিটি' (সংক্ষেপে টি. ভি. এ.) গড়া হলো টেনেসী নদীকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য। ডাঃ সাহা দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটিতে বললেন, দামোদর নিয়ন্ত্রণের জন্য টি. ভি. এর মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত।

মেঘনাদ সাহার এই পরিকল্পনার যুক্তি গবর্মেণ্ট মানলো। ১৯৪৮ সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠান তৈরি হলো, দামোদরকে বশ করার জন্য।

বিজ্ঞানসমাজ-সংঘ গঠনে

মেঘনাদ সাহা আজীবন বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন, এবং নিজে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন, তার কিছু বর্ণনা আগে দিয়েছি। বিজ্ঞানের চর্চা শুধু নিজে ব্যক্তিগত ভাবে করলে দেশের ও দশের উপকার বেশি হয় না। আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছে তা বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর হবে। ইয়োরোপে একশ বছরেরও আগে আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হলো, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সংঘবদ্ধ নয়, সবাই নিজে নিজে যে যেটুকু পারে করছে।

বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে হবে, ভারতের নানা স্থানের বৈজ্ঞানিকদের একত্রিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবরাখবর রাখতে হবে, বিদেশী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

১৯১৩ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরে একবার করে এর অধিবেশন হয়। সে সময় ভারতের সব বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। নতুন নতুন বিজ্ঞানের গবেষণা ও

আবিষ্কারই হলো আলোচনার বিষয়। ১৯২৫ সালে ডাঃ সাহা বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত শাখার সভাপতি ছিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরো বেশি যোগাযোগ দরকার। এলাহাবাদে থাকতে অধ্যাপক সাহা ১৯১৩ সালে যুক্তপ্রদেশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়েন। ১৯৩৪ সাল থেকে সেটার নাম হলো ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, ইণ্ডিয়া।

এই রকম একটা প্রাদেশিক বিজ্ঞান সংঘ গড়েই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। গড়তে চাইলেন সমগ্র ভারতের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান সংঘ। ১৯৩৪ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে ডাঃ সাহা এই প্রস্তাব তুললেন। পরের বছর ন্যাশানাল ইন্‌স্‌টিট্যুট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া নামে জাতীয় বিজ্ঞান সংঘ স্থাপিত হলো। মেঘনাদ সাহা প্রথমে হলেন এই সংঘের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। পরে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেণ্ট।

নতুন করে তিনি অনেক কিছুই গড়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসে মেঘনাদ সাহা শুধু বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের উন্নতি সাধন করলেন তা নয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত গবেষণাগারটির উন্নতির জন্যও খাটতে লাগলেন। এই গবেষণাগারটির নাম ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স। সংক্ষেপে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন। এই গবেষণাগার ছিলো ডাঃ মহেন্দ্র

লাল সরকারের বাড়িতে, ২১০ নং বহুবাজার স্ট্রীটে। আগে ডক্টর সি. ভি. রামন্ ছিলেন এর প্রেসিডেণ্ট। ১৯৪৪ সালে ডাঃ সাহা এই গবেষণাগারের পরিচালনা-কমিটির সেক্রেটারি হন, ১৯৪৬ থেকে প্রেসিডেণ্ট হলেন।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হয়ে তাঁর প্রধান চিন্তা হলো: এ পুরোনো বাড়ি বদলানো দরকার। জায়গা কম, বহুবাজার ষ্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে রিসার্চ চলে না। ভারত ও বাঙলা সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করলেন। আবার তিনি সফলকাম হলেন। নতুন জমি ও বাড়ি তৈরি বাবদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ও বছরে ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের তরফ থেকে বরাদ্দ করা হলো। যাদবপুরে ত্রিশ বিঘা জমির উপর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরাট বাড়ি উঠলো। বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন যাদবপুরে উঠে এলো ১৯৫১ সালে। কিন্তু ১৯৫০ সালে ডাঃ সাহা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট পদ ছেড়ে দিলেন, কারণ, তিনি নিজেই নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে কোনো প্রেসিডেণ্ট একসঙ্গে তিন বছরের বেশি থাকতে পারবেন না। তখন ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেণ্ট হলেন।

এরপর ভারত সরকার ১৯৫৩ সালে ডাঃ সাহাকে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টরের পদে মনোনীত করেন। মৃত্যু পর্যন্ত ডাঃ সাহা এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের উন্নতির জন্য ডাঃ সাহা একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করেন ভারত সরকারের কাছে।

বিজ্ঞানের গবেষণা চালাতে গেলে আধুনিক যন্ত্রপাতি চাই, লোকজন চাই। তার জন্য টাকা চাই। সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থন করে বছরে প্রায় দশ লাখ টাকা হিসাবে পাঁচ বছরের টাকা মঞ্জুর করলো।

বিজ্ঞান চর্চার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করা, পুরাতন গবেষণাগারকে নতুন করে গড়া, বিজ্ঞান সংঘ গঠন করা,—এ সবই বিজ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানীদের জন্য। এ সবের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও মেঘনাদ সাহা জনসাধারণকে ভোলেন নি। সাধারণ লোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতোটুকু জানে? জনসাধারণ যদি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করতে পারে তাহলে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীরা দেশের কতোটুকু কাজ করতে পারবে? প্রতি স্তরের মানুষ যখন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে তখনই দেশে বৈজ্ঞানিক জনমত গড়ে উঠবে। জনমতের মধ্য দিয়েই আসবে গবর্মেণ্ট ও দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও কার্যধারা। তখনই হবে বিজ্ঞানের সর্বমুখী উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্য ও কলকারখানার বিস্তৃতি। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ভাবধারা প্রচার করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালে ডাঃ সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ পরিষদ (Indian Science News Association) গঠন করলেন, এবং 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' নামে মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করতে শুরু করলেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের নানা বিষয় সহজ

করে বলা, এবং দেশের কাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগের পথ দেখানো। মেঘনাদ সাহা এই পত্রিকাতেই শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কতো বিষয়ে লিখেছেন, কতো বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো, কতোদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি লিখতেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়। জাতীয় পরিকল্পনা, যুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, চিকিৎসাশাস্ত্রে ফিজিক্স-এর প্রয়োগ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞান শিক্ষা, ভূবিদ্যা বা জিওফিজিক্স ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সমস্যা, আণবিক বোমা, আণবিক শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগ, দিনপঞ্জিকার সংশোধন, রবীন্দ্রনাথ, কাঁচ শিল্প, ইস্পাত শিল্প, মহাভারত-উপাখ্যানের তারিখ, নদীবিজ্ঞান, ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক' খনন, সিন্ধুনদীর প্রাচীন সভ্যতা, ইত্যাদি ইত্যাদি কতো বিষয়ে তিনি লিখেছেন।

১৯৩৬ সালে কার্নেগী ট্রাস্টের টাকায় অভ্যর্থনা পেয়ে যখন ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করতে যান তখন তিনি জাহাজে বা এরোপ্লেনে সোজাসুজি গেলেন না। যতোটা সম্ভব স্থলপথে চললেন, দেশ দেখতে দেখতে। সঙ্গে নিলেন তাঁর তেরো বছরের ছেলে অজিতকুমারকে। বোম্বাই থেকে বসরা গেলেন জাহাজে। সেখান থেকে ট্রেন নিলেন বাগদাদ পর্যন্ত। পথে মেসোপটেমিয়ায় উর নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখলেন। উর নগর প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো। মাটি-চাপা ছিলো। ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক সার লিওনার্ড উলি এই প্রাচীন নগর মাটি খুঁড়ে বার করেন। প্রাচীন সভ্যতার একটি চমৎকার নিদর্শন এই উর নগর। আগেই বলেছি,

ডাঃ সাহার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিলো। তাই তিনি উর দেখবেন বলে মনস্থ করলেন। দেশেও তিনি মহেন্‌জোদাড়ো, হরপ্পা, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগীর—এ সব ঘুরেছেন।

বাগদাদ থেকে মোটরে চললেন মরুভূমির রাস্তা ধরে বেরূট, বেরূট থেকে হাইফা—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব সীমায়, অর্থাৎ এশিয়ার পশ্চিম সীমায়। হাইফা থেকে জাহাজ ধরলেন।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়বার ঝোঁক মেঘনাদ সাহার ছিলো অসাধারণ। এর মূলে নানা কারণ আছে। মোটামুটি বলা যায়, বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই তাঁর ইতিহাসে টান আসে। তা কি সম্ভব? কোথায় বিজ্ঞান আর কোথায় ইতিহাস? ভেবে দেখো, যোগাযোগ আছে বৈকি। যিনি বিজ্ঞানকে দেশের কাজে লাগাতে চান, বিজ্ঞান দিয়ে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করতে চান, তাঁকে মানব-সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস জানতে হবে। ইংলণ্ডে, ফরাসী দেশে যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থানে সামাজিক পরিবর্তন কী এলো, মানুষের চিন্তাধারা কার্যধারা কি ভাবে বদলালো, এর মূলে বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া কী, এ সবই ইতিহাসের কথা। ইতিহাস মানে শুধু রাজা-মন্ত্রী-যুদ্ধজয়ের গল্প নয়। মানুষের কথা, মানুষের ধারাবাহিক উন্নতির কথাই হলো প্রকৃত ইতিহাস।

তাছাড়া যিনি জোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ্কবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁকে নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মগ্রন্থ ঘাঁটতে হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান অতি

প্রাচীন বিজ্ঞান। মিশর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ ও চীন দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান আরম্ভ হয়েছে চার হাজার থেকে ছহাজার বছর আগে। ইতিহাসের প্রমাণে বলে ৪২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ছ হাজার বছর আগে মিশরে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে বারো মাসে বছর, আর ত্রিশ দিনে মাস গণনা আরম্ভ হয়। এই হলো সবচেয়ে পুরানো দিনপঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার। কিন্তু বারো মাসের প্রত্যেকটি মাত্র ত্রিশ দিন ধরলে বছরে হয় ৩৬০ দিন। পরে মিশরীয়রাই বুঝতে পারলো এতে প্রতি বছরের শুরুতে সূর্যের অবস্থান একই স্থানে আসবে না, আর ঋতু গণনায় গোলমাল হচ্ছে। সূর্য-তারকার অবস্থান ভালো করে দেখে বুঝলো বছরে ৩৬৫ দিন ধরলে মোটামুটি ঠিক হয়।

কিন্তু পরে দেখা গেলো এতেও প্রায় সওয়া দিন কম পড়ে। তাই চার বছর অন্তর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসকে একদিন বাড়িয়ে পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ-কাল, অর্থাৎ 'বছর', মানিয়ে নেওয়া হয়। যে বছরে ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিন ধরা হয় তাকে বলে লীপ ইয়ার (leap year)। এতেও সামান্য গরমিল থেকে যায়।

মেঘনাদ সাহা এই দিনপঞ্জিকা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। এ নিয়ে পড়তে লাগলেন, লিখতে লাগলেন। ভারতের নানা প্রদেশের নানারকমের পঞ্জিকার প্রচলন আছে, নানা রকম ভুলচুক আছে। সংশোধন করা দরকার। কুড়িবছর ধরে এই সব ভেবেছেন লিখেছেন। ১৯৫২

সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর তরফ থেকে পঞ্জিকা-সংশোধন কমিটি (Calender Reform Cammittee) গঠিত হয়। ডাঃ সাহা তার চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর রিপোর্ট ১৯৫৫ সালে ছাপা হয়। বিরাট রিপোর্ট। এই রিপোর্টে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাসের বিশাল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়। তিনি এক সরল, সর্বজনগ্রাহ্য ও নির্ভুল পঞ্জিকার উদ্ভাবনা করেছিলেন। ইউনেস্কোতেও পঞ্জিকা সংশোধনের এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বপঞ্জিকা প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। ডাঃ সাহার পঞ্জিকা পরিকল্পনা ইউনেস্কোতে যথেষ্ট আদর পেয়েছে।

রাজনীতি ও দেশসেবায়

মেঘনাদ সাহা প্রায় চল্লিশ বছর বয়স অবধি নিছক বিজ্ঞানের মধ্যে ডুবে ছিলেন। শুধু পড়া, পড়ানো আর রিসার্চ এই ছিলো সাধনা। ছাত্রাবস্থায় পরাধীন দেশের দুরবস্থা বুঝেছেন, দলে পড়ে স্কুলে ধর্মঘট করেছেন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময়, স্বদেশী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কিন্তু নিজে মুখ্যভাবে বা কার্যকরীভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি।

চল্লিশ বছরের একাগ্র বিজ্ঞান সাধনার পর পরিবর্তন এলো। দেশে বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ বাড়াতে, বিজ্ঞানকে

দেশের কাজে লাগাতে, শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনায় বারবার বাধা পেতে লাগলেন। এই বাধা আসতে লাগলো গবর্মেণ্টের দিক থেকে। ভারত সরকারের ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ডাঃ সাহার মনঃপূত হয় না। দেখলেন এগুলির মধ্যে প্রচুর গলদ। সব চলেছে প্রাচীন পন্থায় ঢিমে তেতালায়। ভাবলেন, এ চলবে না, সব বদলাতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে নির্ভীক গতি আনতে হবে, শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করতে হবে, নদী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, রেফিউজিদের বাঁচাতে হবে, বন্যা দুর্ভিক্ষ আটকাতে হবে,—কতো কি করতে হবে। বহু বলেছেন, বহু লিখেছেন। কিছু ফলও হয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে চেষ্টা করায় আশানুরূপ ফল হয় নি। দেশের উন্নতির ও জাতীয় পরিকল্পনার ভার গবর্মেণ্টের ওপর, রাজনীতির ওপর।

১৯৩০ থেকে ডাঃ সাহা গবর্মেণ্টের নানা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বেসরকারী উপদেষ্টা বা অবৈতনিক কর্মী হিসাবে। বিজ্ঞান বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, এসবের সঙ্গেই সংস্রব ছিলো বেশি।

ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে কংগ্রেস রাজত্ব এলো। দেশে নানা সমস্যা। দেশ গরিব, কলকারখানার অভাব, চাষ-আবাদের দুরবস্থা, তার ওপর ভারত ভাঙার ফলে উদ্‌বাস্তু মানুষের সমস্যা। দেশী গবর্মেণ্ট সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। মেঘনাদ সাহা ভাবলেন—সরকারী পরিকল্পনায় অনেক ত্রুটি আছে, আরো দ্রুত গতিতে কাজ চলা দরকার, যন্ত্রশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের ওপর আরো জোর দেওয়া চাই।

শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, "বাইরে থেকে বেশি কিছু করতে পারবে না। পার্লামেণ্টে ঢোকো।" সরাসরি রাজনীতিক্ষেত্রে ঢুকবার ইচ্ছে ডাঃ সাহার বিশেষ ছিলো না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এবং আরো কয়েকজন বন্ধু বোঝালেন—তাঁর জাতীয় পরিকল্পনা, শিক্ষা বিস্তার, বৃহৎ শিল্প ইত্যাদির গভীর জ্ঞান ভারত সরকারের যথেষ্ট উপকার লাগবে। অবশেষে তিনি ১৯৫১ সালের নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজী হলেন।

কংগ্রেস দলের অনেকে একথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন না। মেঘনাদ সাহা বরাবরই চরকা-খদ্দরের বিপক্ষে বলেছেন। বলেছেন, স্বাধীন ভারত মন্থর গতিতে চলবে না, বৃহৎশিল্প কল কারখানা চাই। আধুনিক কলকারখানা এবং বিজ্ঞান দিয়েই একমাত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে, একথা বলেছেন। এই সব নানা কারণে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পেলেন না। স্বাধীন ভাবে দাঁড়িয়েই তিনি নির্বাচিত হলেন। ডাঃ সাহা পার্লামেণ্টের সদস্য হলেন, বিরোধী (opposition) দলে।

পার্লামেণ্টের সদস্য হয়ে ডাঃ সাহা ভারত সরকারকে নানাভাবে সমালোচনার মধ্য দিয়ে দেশের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে দিতে লাগলেন। বিরোধী দলের সদস্য হলেও ভারত সরকার তাঁর সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতেন। ডাঃ সাহার বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিলো দেশের শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক

গবেষণার বহুল ও ব্যাপক প্রচলন, বৃহৎশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি, নদী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এসব বিষয়ে ভারত সরকারের কোথায় ঢিলেমি, কোথায় ত্রুটি, কোন পথে জাতীয় সমস্যার সুসমাধান হতে পারে, অন্যান্য দেশ—ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া—কী করে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে, ডাঃ সাহা এ সব কথা যুক্তি ও বাস্তব তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর যুক্তি ছিলো অকাট্য, তাঁর মতামত ছিলো দেশেবিদেশের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সরকারের কার্যকলাপের তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও অকাট্য যুক্তি শক্তিধারী দলকে বিব্রত করতো। একদিন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে জনৈক কংগ্রেস নেতা ডাঃ সাহাকে ঠাট্টা করে বললেন, "ডাঃ সাহার দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেই ভালো হয়।"

উত্তরে ডাঃ সাহা বললেন "বৈজ্ঞানিকদের বদনাম আছে, তারা থাকে আত্মভোলা হয়ে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক-হয়ে। আমিও আগে তাই ছিলাম। কিন্তু যুগ বদলেছে, দেশের পরিকল্পনা ও প্রশাসনের কাজে বিজ্ঞানের ধারা এ যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমি রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রমশ এসে পড়েছি, আমার সামান্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে আমার দেশকে সেবা করতে।"

শিক্ষাব্রত, জাতীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞানমন্দির গঠন ও পরিচালনায় মধ্য দিয়ে মেঘনাদ সাহা যেভাবে দেশকে সেবা করেছেন তার তুলনা হয় না। শুধু যে তিনি রাজসরকারের

স্তরের মধ্য দিয়েই দেশের কল্যাণ এনেছেন তা নয়। তাঁর ছিলো গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ। যৌবনে তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করতে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে, বিশ্বের যশ-খ্যাতি লাভ করেও তাঁর সেই আর্তসেবার বাসনা অটুট ছিলো।

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে মেঘনাদ সাহা একটি প্রকাণ্ড সাহায্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিলো না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়েছিলো, মুখের একপাশ সামান্য পক্ষাঘাতের মতো হয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। এ সব সত্ত্বেও পরিশ্রমের অন্ত ছিলো না। এই সেদিনও তিনি রেফিউজি ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, আসাম, ত্রিপুরা অঞ্চল পর্যন্ত। উদ্বাস্তুদের দুর্দশার কথা জনসাধারণকে ও ভারত সরকারকে তিনি বার বার জানিয়েছেন।

১৩ই ফেব্রুয়াবি, ১৯৫৬। মেঘনাদ সাহা চললেন দিল্লী, পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিতে। এবার অনেক কিছু আছে বলবার: উদ্বাস্তুদের সমস্যা, বেকার ও কাজ-থেকে-ছাঁটাই লোকদের সমস্যা, বাঙলা-বিহার যুক্ত হবার সমস্যা, নদী নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থা-মণ্ডলীর সমস্যা। দিল্লী পৌঁছালেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি সকালে লোকসভায় অধিবেশনে যোগ দিতে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে চলেছেন। হেঁটেই চললেন, বেশিদূর নয়। সামনে একটু চড়াই রাস্তা। তাড়াতাড়ি পা চালালেন। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলো। পড়ে গেলেন।

লোকজন এসে পড়লো। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এলেন, বলে উঠলেন "একি, ইনি যে ডক্টর মেঘনাদ সাহা।' তাড়াতাড়ি করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলো। তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দেশমাতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

এই মর্মন্তুদ সংবাদ দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। পার্লামেণ্টের সভ্যরা নিস্তব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এই ভারতপূজারী নিঃস্বার্থ কর্মবীর বৈজ্ঞানিকের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের উদ্দেশে দেশের নেতারা সান্ত্বনা-বাণী পাঠালেন। দেশ হারালো তাঁর সুসন্তান সেবককে।

সরস্বতী পুজোর আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হলো। সরস্বতীর বরপুত্র বুঝি সরস্বতীর কাছেই চলে গেলেন।

জীবনী-বিচিত্রা